আমরা যুক্তিবাদী

প্রধান সম্পাদক :

সম্পাদক :

উপদেষ্টা :

রেজিস্টার্ড অফিস :
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

. /২-৩

প্রচ্ছদনিবন্ধ :

লালগড় প্রসঙ্গে ওঁরা বলেন :

ফিচার :

প্রচ্ছদনিবন্ধ :

বিশেষ প্রবন্ধ :

বিশেষ প্রবন্ধ :

ফিচার :

ফিচার :

বিশেষ প্রবন্ধ :

রিপোর্ট :

রিপোর্ট :

রিপোর্ট :

পুস্তক সমালোচনা :

সম্পাদকীয়

“হট্টমালার দেশ” বা “যুগের হাওয়া”

ছোটবেলায় গল্প পড়েছি ‘হট্টমালার দেশে’—প্রেমেন্দ্র মিত্র আর লীলা মজুমদারের লেখা। হট্টমালার দেশ হচ্ছে এক কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য—সেখানে কোনও কিছুরই অভাব নেই। সবাই যার যার প্রয়োজনীয় জিনিস পেয়ে যায়। একটাই বস্তু নেই—সেটা হচ্ছে টাকা-পয়সা। দুটো চোর সেই দেশে গিয়ে মহা ফাঁপরে পড়লো। চুরি করার তো দরকারই হচ্ছে না—তাহলে ওরা কী করে? বাদল সরকার নাটকও করেছেন এই গল্প নিয়ে।

সত্যিই কি সম্ভব এই ইউটোপিয়ান স্বর্গরাজ্য? যেখানে মারামারি নেই, হিংসা, খুন, রক্তপাত, যুদ্ধ নেই?

‘অর্থই অনর্থের মূল’—খুব পুরনো কথা। সত্যি কথা। কিন্তু অর্থ ছাড়া অর্থনীতি কি হয়? অর্থই তো চালাচ্ছে সব কিছু। দেশনীতি, সমাজনীতি সব। শক্তিশালী দেশ, মানে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী—অন্যের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে তাদের শর্ত। শোষণ করছে অন্য ছোট বা দুর্বল দেশকে নিজের নিয়ম মেনেই।

এই আমাদের পৃথিবী? আমাদের প্রচলিত অর্থনীতি এতদিনে আমাদের এইখানে এনে ফেলেছে? এই সভ্যতার আমরা গর্ব করি?

তো এই যখন চিত্রটা, তখন আমরা কি শোষণহীন, রক্তপাতহীন, সুন্দর সাম্যের সমাজ কল্পনা করতে পারি? না কি কল্পনাটা শুধু কল্পনাই থেকে যাবে?

আমরা জানি এই মুহূর্তে একমাত্র বাঁচার রাস্তা স্বয়ম্ভর গ্রাম করে, প্রাকৃতিক সম্পদের সমবন্টনের মধ্যে দিয়ে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে সাম্য

বজায় রেখে। তার জন্য সারা পৃথিবী একটাই গোটা গ্রাম হলে বেশ হয়। তাহলে 'বাইরের প্রলোভনের হাতছানি' এই স্বয়ম্ভর মানুষদের বিপথে চালিত করতে পারবে না। অর্থাৎ গোটা বিশ্বটাই একটা গ্রাম—সমস্ত পরিবেশের রক্ষার ভার সকলের, সমস্ত সম্পদের ভাগ সবাই ভোগ করবে। এটা কি সত্যি হতে পারে?

বোধহয় পারে। এরকম একটা হাওয়া কিন্তু উঠেছে। যুগের হাওয়া। প্রযুক্তির প্রভুত উন্নতি সত্ত্বেও অর্থনীতিতে ধস নামছে কেন? কোথাও একটা হিসাবের ভুল হচ্ছে।

এই গোটা বিশ্বে এই মুহূর্তে যা রসদ বা সম্পদ (Resource) আছে, তা যদি সমান ভাবে ভাগ করা হয় সকলের নামে, তার সঙ্গে যদি বন্ধ করা হয় অপচয় এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয়, তাহলেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে, খেয়ে, পরে বেঁচে থাকতে পারে।

এটা আজ বৈজ্ঞানিক সত্য। তাহলে অসুবিধেটা কোথায়? অসুবিধা আমাদের মানসিকতায়। প্রথমত—আমরা দারিদ্রের ভয় পাই, তাই সর্বদা অন্যের থেকে ভাল থাকতে চাই। ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাড়াতে থাকি। দ্বিতীয়ত—প্রচলিত সিস্টেমের বাইরে যেতে আমাদের অনীহা। যারা মোটামুটি ভাল আছি, তারা সমাজের এই স্থিতাবস্থার পরিবর্তন চাই না।

যাবতীয় দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের মূলে আছে অর্থ, অর্থোপার্জনের চেষ্টা, অন্যকে ঠকিয়ে, ভুল বুঝিয়ে, মিথ্যে বলে মুনাফা বাড়ানো। ক্ষমতা প্রতিপত্তি বাড়ানোও সেই শেষ পর্যন্ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেরই লোভে। তাই প্রযুক্তির চরম উন্নতি ও সুদূরপ্রসারী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যদি সত্যি সত্যিই সমাজচালনায় 'অর্থের' ভূমিকাকে একেবারে শুন্য করে দেওয়া যায়, দারিদ্র আর দুর্নীতি-এর দুই 'দ' এর থেকে মানুষ সুস্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে। পৃথিবীটা ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে।

তখন দুর্নীতিবাজদের অবস্থা হবে সেই দুটো চোরের মত। হট্টমালার দেশে হাজির হয়ে চারিদিকে সোনাদানা, খানাপিনা দেখে তাদের হাত নিশপিশ করছে। মনটা ছোঁক ছোঁক করছে—কী করে চুরি করা যায়! কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তারা ভেবে দেখল, চুরি করে লাভ নেই। বেচবে কাকে? আর দরকারই বা কী? চাইলেই যে কোনও দোকানে ঢুকে গিয়ে পেটভরে খেয়ে নেওয়া যায়। দুদিনেই তারা মনের দুঃখে চুরি করা ছেড়ে দিল।

লালগড় সহ সব সন্ত্রাস বন্ধ হোক

প্রবীর ঘোষ

এত সন্ত্রাস কেন?

যে কোনও সৎ যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী মানুষই সন্ত্রাস বিরোধী। আমরা তাই সন্ত্রাস ও ব্যক্তিহত্যার বিরোধী। আমরা চাই সন্ত্রাস বন্ধ হোক। 'সন্ত্রাস' মানব অগ্রগতির বিরোধী।

সন্ত্রাসের উৎপত্তির মূল ধাপ তিনটি। **এক** : রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, **দুই** : রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে কোণঠাসা মানুষ একদিন আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু করে পাল্টা সন্ত্রাস। **তিন** : শোষিত হতদরিদ্র মানুষ একদিন তাদের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য হয়ে অস্ত্র তুলে নেয়।

সন্ত্রাস বন্ধ করতে হলে সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে—রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মানবাধিকারের হত্যাকারী। এবং স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রই সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী।

মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের প্রয়াস

রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরা ভালমতই ওয়াকিবহাল যে—বহু সদস্য রাষ্ট্রই স্বেচ্ছাচারী ও সন্ত্রাসবাদী। তাদের হাত থেকে বিপন্ন নাগরিকদের রক্ষা করতে তাই একটি সনদ রচনা করে রাষ্ট্রসংঘ পেশ করে তার সাধারণ সভায়। এটা ১৯৪৮-এর ঘটনা। সাধারণ সভায় সনদ গৃহীত হয়। এই সনদের নাম ছিল 'Universal Declaration of Human Rights'। ভারতও এই সনদের একজন স্বাক্ষরকারী।

তারপরও যাতে কোনও রাষ্ট্র সন্ত্রাসবিরোধী আইন তৈরির নামে তাদের দেশবাসীদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার খর্ব করতে না পারে তাই আরও একটি সনদ তৈরি করে রাষ্ট্রসংঘ। ১৯৬৬ সালের সাধারণ সভায় এই 'International Covenant on Civil & Political Rights' সংক্ষেপে 'ICCPR' (আন্তর্জাতিক চুক্তি নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে) পেশ ও গৃহীত হয়। এই চুক্তিপত্র বা সনদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, কোনও স্বাক্ষরকারী দেশ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন তৈরি করতে চাইলে তা করতে হবে এই 'ICCPR' আইনকে অলঙ্ঘনীয় (Nonderogable) মেনে নিয়ে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

ভারত এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ। অতএব আইনত এই চুক্তিপত্র মেনে চলতে বাধ্য।

আন্তর্জাতিক আইন ভাঙার স্থপতি ভারত

হাঁড়ির একটি ভাত

লালগড় পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অঞ্চল। এই অঞ্চলে স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত স্বাস্থ্য-শিক্ষা-জীবিকা-পানীয় জল-বিদ্যুৎ-রাস্তা ইত্যাদি কোনও পরিকাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেনি। ৩২ বছরের 'কম্যুনিস্ট' শাসনেও লালগড় সহ জঙ্গলমহল (পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) চূড়ান্ত অবহেলিতই রয়ে গেছে।

২ নভেম্বর ২০০৮। জঙ্গলমহলের শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত প্রকল্পের অনুষ্ঠান শেষে ফিরছিলেন এ'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ান। কনভয় লক্ষ্য করে একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটে লালগড় থানা এলাকায়। লালগড় থানার ওসি সন্দীপ সিংহ রায়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার মনোজ বর্মা। দুজনেরই সুনাম আছে 'অনুগত' হিসাবে।

৫ তারিখ পর্যন্ত জলঘোলা পর্যায় চলল। তারপর আলিমুদ্দিন স্ট্রিট আর মহাকরণ জানাল—বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে স্থানীয় মাওবাদীরা। ৬ নভেম্বর পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে লালগড় থানার অফিসার ইনচার্জ বিস্ফোরণ স্থান থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে কাঁটাপাহাড়িতে মাওবাদী খোঁজার নামে হামলা চালায়। আদিবাসী মহিলাদের শ্লীলতাহানী করে পুলিশ। আদিবাসী মানুষদের উপর অমানুষিক মারধোর করে। পুলিশের বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে চিতামণি মুর্মূর দু-চোখের মণিই থেঁতলে যায়। কাঁটাপাহাড়ি স্কুলের ক্লাশ নাইন- টেনের কয়েকজন ছাত্রকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। এই স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টার ক্ষমানন্দ মাহাতকে নিয়ে যায় থানায়। থানায় ছাত্র ও শিক্ষকদের মারধোর করার পর ছাত্রদের সামনেই ক্ষমানন্দবাবুকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সন্দীপ রায় বলে, "দেখি শালা, তুই হিন্দু না মুসলমান?"

এই দিনই চলছিল 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি' গঠন করার সভা। নতুন করে এই দিনের পুলিশি সন্ত্রাসের ঘটনা আগুনে ঘি ফেলার কাজ করল। পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পাল্টা সন্ত্রাসের পথে না গিয়ে ওঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, পুলিশ বয়কটের আন্দোলনে নামবেন। ওঁদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন ছত্রধর মাহাত ও সিদু সোরেন।

পুলিশ সুপার লালগড়ের ঘটনার একটা খন্ডচিত্র পাঠালেন রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি অমিতকিরণ দেবকে। চিফ সেক্রেটারি আদিবাসী ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সেক্রেটারি আর ডি মিনাকে লালগড়ে পাঠালেন তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে।

মিনা সরকারকে দেওয়া তদন্ত রিপোর্টে জানালেন, আদিবাসীদের উপর যে ভয়ংকর অত্যাচার পুলিশ চালিয়েছে, তা দেখে তিনি স্তম্ভিত। রিপোর্টে তিনি সন্দীপ সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার সুপারিশ করলেন। পুলিশ সুপারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করলেন।

'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি' পুলিশ বয়কট শুরু করে। সরকার এই বয়কট তুলে নেবার কথা বলে। কমিটি জানায়, আদিবাসী মেয়েদের শ্লীলতাহানী করেছে পুলিশ। এবং এ'সবই ঘটেছে পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে। গ্রামে এসে গ্রামবাসীদের সামনে পুলিশ সুপার সহ পুলিশদের কান ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

আর ডি মিনার তদন্ত রিপোর্ট ও সুপারিশ গ্রহণ করলেন না। ওসির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে হলে ওসিকে গ্রেপ্তার করতে হয়। পাগল নাকি? এতে জোহুজুর পুলিশরা কি আর ক্রীতদাস থাকবে? 'নিরপেক্ষ' হলেই বিপদ!

একই সঙ্গে 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'র সামান্য দাবিকেও (গ্রেপ্তারের বদলে ক্ষমা চাওয়া) প্রেস কনফারেন্স করে চিফ সেক্রেটারি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন—পুলিশদের ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব সময়ই পুলিশের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ। সিঙুর নন্দীগ্রাম, রিজওয়ানুর, খেজুরি, বর্ধমানের মঙ্গলকোট, মেমারি—সর্বত্রই সিপিএম পার্টি এলাকা দখল করতে পুলিশকে দিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠ ইত্যাদি করিয়েছে। সিপিএম-এর 'অ্যাকশন স্কোয়াড'-এর অগ্রবাহিনী হিসেবে থাকে পুলিশ বাহিনী। বিনিময়ে পুলিশের সমস্ত রকম বে-আইনি কাজে উদ্ধারকর্তা হিসেবে সিপিএম সরকার পাশে দাঁড়িয়েছে বার বার।

সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ভারতে সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক দলের রমরমা

বিস্ময়কর একটি তথ্য—ভারতের সব নির্বাচন-নির্ভর রাজনৈতিক দলই দেশে 'কঠোর সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইন' করতে এক পায়ে খাড়া। এইসব রাজনৈতিক দলগুলো আসলে এক একটি নির্ভেজাল Terrorist group ছাড়া কিছু নয়।

'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশানাল' পৃথিবীর অগ্রণী মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠন। ১৯৯৬ সালে এই সংগঠন ১৫০টি দেশের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে জানায়, ৮২টি দেশে সরকারের তরফ থেকে 'সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম' চালান হয়। এইসব সরকার কিডন্যাপ, এনকাউন্টারের নামে ঠান্ডা মাথায় পুলিশ বা সেনাকে দিয়ে হত্যা, বেআইনি ভাবে বিনাবিচারে আটকে রাখা, আইনের সাহায্য নিতে না দেওয়া, সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া রাতে ঘরে ঢোকা, সাক্ষী না রেখে গ্রেপ্তার করা মানুষটির কাছে বেআইনি অস্ত্র ও রাষ্ট্রবিরোধী কাগজপত্র পাওয়ার অভিযোগ আনা ইত্যাদি সমস্ত

রকমের জঘন্য অপরাধমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যায়। নাগরিকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পুলিশ ও সেনাদের উপর ছেড়ে দেয় লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি যা খুশি করার অধিকার।

৮২টি দেশের মধ্যে ভারত আছে। পূর্ব ভারতের অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, উত্তর ভারতের কাশ্মীর, মধ্যপূর্ব ভারতের ছত্তিশগড় ও দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অতি তীব্র। রাষ্ট্র যে এলাকায় বা গোষ্ঠীর উপর সন্ত্রাস চালায় তার বিভৎসতা অনুমান করা বাইরের নাগরিকদের পক্ষে অসম্ভব কারণ মিডিয়াগুলোর বেশিরভাগই নিরপেক্ষ নয়। শক্তিশালী শাসক দল বা শক্তিশালী বিত্তবান বিরোধী দলকে সমর্থন জানিয়ে খবর বানায়, খবর চাপে, খবর বিকৃত করে, খবর blackout করে। এরা কখনও সিপিএম-এর ছায়াসঙ্গী, 'বুদ্ধ বিনা গীত নাই', আবার পালা বদল হতেই মমতার গাড়িতে, বিমানে যাত্রাসঙ্গী হয়ে মমতাকে আকাশে তুলে দেয়। মইটা কাড়া শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষা। এরা 'মাওবাদী' নেতা 'কিষণজি', 'বিকাশ' এর ডামি হাজির করে exclusive story খাড়া করে, এমনটাই অনেকের বিশ্বাস।

এরাই 'পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'র ডানা ছেঁটে 'জনসাধারণের কমিটি' বানিয়ে দেয়। কারণ 'পুলিশি সন্ত্রাস' শব্দটা বেজায় খারাপ। শাসকদল এমন শব্দ শুনতে চায় না।

সাঁওতাল হুল (বিদ্রোহ)-এর আর এক নাম 'লালগড়'

'লালগড়' নামটা আজ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বে পরিচিত নাম। আর একবার মনে করিয়ে দিই, ২০০৮-এর নভেম্বরে শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত প্রকল্পের অনুষ্ঠান শেষে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সে সময়কার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ান। কনভয় লক্ষ্য করে ল্যান্ডমাইনের একটি ছোট্ট ধামাকা ঘটে। তারপর লালগড় ও তার আশে-পাশের অনেকটা অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস চালায় পুলিশ।

পুলিশ হঠাৎ ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণস্থল থেকে ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরের ছোট পেলিয়া, বড় পেলিয়া, বাঁশবেড়, কাঁটাপাহাড়ী গ্রামগুলোতে হানা দিল কেন? বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছিল এক কিলোমিটার লম্বা তার টেনে। বিস্ফোরণ স্থলের আশে-পাশের গ্রামে পুলিশ হামলা চালায়নি। এমনকি জিজ্ঞাসাবাদও করেনি। কারণ ওই অঞ্চলটা সিপিএম-এর শক্ত ঘাঁটি। ওরা জানে, সিপিএম-এর ওপর হাত দিলে হাত পুড়বে।

লালগড় যেতে হলে নামতে হবে মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলে ঘেরা লালগড়। এখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে ঝাড়খন্ডের জঙ্গলঘেরা এই অঞ্চলকে বলে 'জঙ্গলমহল'।

মেদিনীপুর স্টেশন থেকে লালগড় যেতে একটা সরু রাস্তা মিলবে। পিড়াকাটায় গিয়ে রাস্তা শেষ। পিড়াকাটা থেকে লালগড় যাওয়ার রাস্তা পিচ বাঁধানো। এই রাস্তা ধরে ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া যায় বাস ও লরি এবং পুলিশ ও আধাসেনার গাড়ি। আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা থাকেন পিচ রাস্তার ১০, ২০, ৫০ বা ৭০ কিলোমিটার দূরের গ্রামে। পাকা রাস্তা নেই। কাঁচা রাস্তা দিয়ে গাঁয়ের মানুষ যাতায়াত করেন পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে বা সাইকেলে। এই জঙ্গলমহল হল 'নেই'-এর রাজত্ব। পথ নেই, সেচ নেই, তাই চাষ নেই, বিদ্যুৎ নেই, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, পানীয় জল নেই। একবেলার খাবার জোটাতে ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। জঙ্গলের কাঠ শালপাতা ও কেন্দু পাতা সংগ্রহই প্রধান জীবিকা।

জঙ্গলমহলে 'মাঝি মাড়ওয়া' ও 'দিশম মাঝি'রা হল আদিবাসী সমাজের মাথা। বিয়ে, শুভ কাজ, সমাজের বিচার ইত্যাদি সবেই ওরা অনিবার্য। অতএব শাসক দল ওই সুবিধাভোগী শ্রেণিকে হাতে রাখে। ওরা যেখানে ভোট দিতে বলবে সেখানেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভোট পড়বে। ওই স্বার্থভোগীদের লোভের দৌলতে জঙ্গলমহলে এতকাল অত্যাচার ও বঞ্চনা চালিয়ে গেছে সরকার ও শাসক দল। বিপিএল কার্ডে চুরি, রেশন দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজে চুরি, কম মজুরিতে কাজ করান ইত্যাদি সবই চলছিল মসৃণ ভাবে। ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকা আসছিল এবং যাচ্ছিল সিপিএম নেতা ও তাদের আত্মীয়দের পেটে। শুকনো পাতায় ছাওয়া মাটির বাড়িই আদিবাসীদের মাথা গোঁজার ঠাঁই।

এতদিন সিপিএম ভেবে আসছিল, আদিবাসীদের চিরটাকাল শোষণ ও অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষেই যাবে। ওদের মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে দেবে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জঙ্গলমহলের চিত্রটা একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছিল। শোষিত, বঞ্চিত মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়ালো কিছু সাম্যকামী মানুষ, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখা মানুষ। সালটা ১৯৯৮।

সিপিএম-এর ইনফরমার গ্রামবাসী ও 'মাঝি'-রা খবর দিল হাওয়া বদলের। সেই ১৯৯৮ থেকেই শুরু হল পুলিশি অত্যাচার, গ্রেপ্তার, এনকাউন্টার। **গোটা জঙ্গলমহলে এমন একটিও পরিবার নেই যাদের পরিবারের অন্তত একজনকেও মাওবাদী বলে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করেনি পুলিশ।**

৬ নভেম্বর ২০০৮-এর পুলিশি অত্যাচার আদিবাসী আন্দোলনের চিত্রটাই দিল পাল্টে। হাজার হাজার আদিবাসী নারী-পুরুষ লালগড় থানায় হাজির হল নির্দোষ ছাত্র-শিক্ষক ও মানুষদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে।

পুলিশ জনতাকে কথা দেয়—ওদের এখুনি ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে জনতা ভোরে ফিরে যায়। এই সুযোগে পুলিশ অভিযুক্তদের মেদিনীপুর থানায় পাঠিয়ে দেয়। সহজ-সরল আদিবাসীরা পুলিশের উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারায়। তারা জানিয়ে দেন, বিশ্বাসঘাতক পুলিশদের আর গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

৭ নভেম্বরই আন্দোলন গতি পেল প্রায় সব আদিবাসী গোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে। প্রতিটি গ্রাম থেকে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি তৈরি হল। লক্ষণীয় ছিল যুব সমাজের উপস্থিতি। 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'-র সম্পাদক হলেন ছাব্বিশ বছরের তরুণ, সিদু সোরেন। মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব দেওয়া হল ছত্রধর মাহাতোর ওপর। কোনও গ্রামের মানুষদের যদি মনে হয় তাদের কোনও প্রতিনিধি ঠিক মত কাজ করছেন না, তবে তাঁকে ফিরিয়ে আনার অধিকারও রয়েছে গ্রামবাসীদের। আবার নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলার অধিকারও রয়েছে 'সর্বজন সভা'র। ঘোষিত হল, লালগড়ে কেউ কোনও রাজনৈতিক ঝান্ডা নিয়ে আন্দোলন করতে পারবে না।

এ এক অসাধারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ওঁদের কেউ যদি বলে—'গণতন্ত্রের শত্রু', তাহলে আমরা তাদের বলবো—'হয় পাগল, নয় ধান্দাবাজ'।

আন্দোলন ভাঙতে সরকার ও মিডিয়া

ছত্তিশগড় সরকার সাম্যকামীদের শেষ করতে গড়ে তুলেছে 'সালবা জুডুম'। সালবা জুডুম ছত্তিশগড় সরকারের বেআইনি কাজ, বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সিপিএম সরকার জঙ্গলমহলের আন্দোলনকে কড়া হাতে দমন করতে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদেরই লেলিয়ে দিতে চেয়েছে। আদিবাসীদের নিয়ে সালবা জুডুমের ধাঁচে গড়ে তুলতে চাইছে 'আদিবাসী প্রতিরোধ কমিটি'।

শালবনীতে প্রতিরোধ কমিটিকে প্রশিক্ষিত করতে ১৩২ একর জমির উপর প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। আদিবাসীদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেওয়া হবে। দেওয়া হবে মাস মাইনে।

আদিবাসীদের গণতান্ত্রিককরণ পদ্ধতি দেখে আন্দোলন ভাঙতে উঠে পড়ে

নামলো সিপিএম। পাশে নিল কিছু সিপিএম ক্যাডার ও মাঝি। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। যাদের নিয়ে প্রতিরোধ কমিটি গড়া হবে, তারাই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেল ভয়ে, জনরোষের ভয়ে। 'আদিবাসী প্রতিরোধ কমিটি' গড়ে ওঠার আগেই ভেঙে গেল।

ছত্রধর মাহাতো অভিযোগ করেছেন, 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'কে শুধু 'জনগণের কমিটি' বলে মূল আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে তৎপর হয়েছে কিছু মিডিয়া। আদিবাসী জনগণ শুধু শোষিত নয়, সুদীর্ঘ কাল ধরে পুলিশি অত্যাচারের শিকার। রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি মিডিয়া সেই সত্যকে আড়াল করতেই আন্দোলনের নামের উপর কাঁচি চালিয়েছে।

৭ নভেম্বর ২০০৮, ৯৮টি গ্রামের ১০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে গড়ে উঠেছিল যে 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি', ২১ নভেম্বর ২০০৮ তার সঙ্গে যুক্ত হল ৬০টি গ্রামের আরও ৬০০ নির্বাচিত প্রতিনিধি।

আদিবাসী নারী-পুরুষরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে টাঙি, বর্শা, কুঠার, হেঁসো ইত্যাদি নিয়ে যেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তাতে মনে হচ্ছে দেড়শো বছর পর আবার ফিরে এলো সাঁওতাল 'হুল'।

৩২ বছরে যা হয়নি তা হয়েছে গত ৮ মাসে

'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'কে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কিছু দরদি মানুষ। তাঁরা গ্রামবাসীদের স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ে তোলার পরিকল্পনা দেন। গ্রামবাসীরা পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করতে কাজে হাত দেন।

৩২ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যা করেনি, তা-ই করে দেখালেন গ্রামবাসীরা। ৬০ ফুট গভীর দীঘি তৈরি করে সেচের খাল কেটে নিয়ে গেছে বিভিন্ন প্রান্তে, গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল বসিয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র করেছে, ৫০ কিলোমিটার মোরমের রাস্তা তৈরি করেছে, মদের ভাটি ভেঙেছে। এসবই করেছে নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে, প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া, সরকারি সাহায্য ছাড়া।

শোষিত, হতদরিদ্র এই আদিবাসী গোষ্ঠীকে যারা সাহায্য করতে এসেছে তাদের সিপিআইএম চিহ্নিত করেছে 'মাওবাদী' বলে। 'মাওবাদী' বলে দেগে দিলে বিনাবিচারে দীর্ঘ বছর আটক রাখা যায়, এনকাউন্টারের নামে খুন করা যায়। অতএব...

অত্যাচারি সিপিআই(এম) সরকার ও সিপিএম পার্টি গরিবদের পাশে দাঁড়ান মানুষগুলোকে 'মাওবাদী', 'সন্ত্রাসবাদী' বলবে—এটাই স্বাভাবিক।

তবে আদিবাসী মানুষেরা মনে করে, মাওবাদীরা আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। আর শত্রু হল পুলিশগুলান।

লালগড়ে যৌথ বাহিনীর 'দখল' অভিযান

রাজ্য পুলিশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের ক্ষোভকে কেন্দ্রের দিকেও ঠেলে দিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু কেন্দ্রের কাছে সেনা সাহায্য চাইলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চিদাম্বরম তৎপরতার সঙ্গে কেন্দ্র থেকে সেনা পাঠালেন। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, হেলিকপ্টার, আধুনিকতম নানা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে লালগড় তথা জঙ্গলমহল অভিযানে নামলো যৌথবাহিনী।

কলকাতার ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে পত্রিকার সাংবাদিককূল এমন একটা দুর্ধর্ষ খবর সংগ্রহ করতে ছুটলেন। তারপর আমরা ওঁদের তোলা ছবি ও বক্তব্য থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ বাহিনীর একের পর এক 'এলাকা দখল'-এর রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগলাম। এ-যেন ১৯৭১-এর ভারতীয় সেনার ঢাকা অভিযানের চিত্র। একের পর এক অঞ্চল দখল করতে করতে এগোচ্ছে ভারতীয় সেনারা। মনে তাদের কঠিন প্রতিজ্ঞা—ঢাকা দখল করে 'স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তুলে দেবো মুজিবর রহমান ও শেখ হাসিনার হাতে। শেখ হাসিনা তখন দমদমের বাঙুর এভিনিউ-এর নিরাপদ আশ্রয়ে।

লালগড় অভিযানের খবর দেখছি, খবর শুনছি। মাঝে-মধ্যে একটা-আধটা ছোট মাপের মাইন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। মাওবাদীদের দখল মুক্ত করতে অভিযান। কোথাও প্রতিরোধ নেই। না মাওবাদীদের তরফ থেকে, না পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির তরফ থেকে।

আমরা সাংবাদিকদের কল্যাণে জানলাম, 'কোবরা' বাহিনী নামের এক অত্যাশ্চর্য বাহিনী যৌথ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ওরা সাঁজোয়া গাড়ি থেকে, হেলিকপ্টার থেকে টপাটপ নেমেই মুহূর্তে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে হাওয়া। ওরা গাছের সঙ্গে জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেছে। শুনে আমরা রোমাঞ্চিত হলাম। আরও রোমাঞ্চ জাগলো যখন জানলাম, ওরা ভাত রুটি খায় না। জঙ্গলে যা পাওয়া যায় তাই খায়। সাপই কাঁচা খায়। এও জানতে পারলাম, ছত্রধরের অবস্থাও খুবই খারাপ। ওর মাথায় ছাতা ধরার মত একটি লোকও নেই। জনসাধারণহীন জনসাধারণের কমিটির মাথার খবর পেয়ে উল্লসিত সিপিআই(এম)। লাল পতাকা উড়িয়ে, লাল টুপি পড়ে গোটা পঞ্চাশেক মটোরবাইক দাপিয়ে বেড়াল লালগড়ের দখলমুক্ত এলাকায়।

তৃণমূল থেকে চিফ সেক্রেটারি ও হোম সেক্রেটারির কাছে অভিযোগ জানালো—যৌথ অভিযানের আড়ালে সিপিআই(এম) মটোরবাইক বাহিনী ঢুকিয়ে এলাকা দখল করতে চাইছে।

দুই সেক্রেটারির সোজাসাপটা জবাব—আপনারাও শ'খানেক মটোরবাইক নিয়ে ওই এলাকায় ঘুরুন। এতে স্থানীয় মানুষ ভয়মুক্ত হবে।

ইতিমধ্যে ২২ জুন ২০০৯ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম ঘোষণা করলেন ভারতে মাওবাদী পার্টিকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হল। সোনিয়া গান্ধি ও মন্ত্রীসভার অনুমতি না নিয়ে চিদাম্বরম এটা করেননি। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে Unlawful Activities Preventions Act (Amendment) 2008 সংক্ষেপে UAPA প্রয়োগ করা হবে—এও ঘোষণা করা হল।

এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু ঘোষণা করলেন, কেন্দ্রের এই 'কালাকানুন' পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করা হবে না।

তারপর আর কী! 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী' বুদ্ধদেববাবু দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। 'মাওবাদী' বলে 'নিরপেক্ষ' পুলিশরা যাদেরই ধরছে, তাদের বিরুদ্ধেই UAPA প্রয়োগ করে আবারও প্রমাণ করে দিলেন—সি.পি.আই(এম) কখনও কথা রাখে না।

এতদিন মিডিয়ার ছবিতে ও কথায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যাঁরা, তাদের বিশ্বাস ভেঙে-চূরে খান খান হয়ে গেল। অবশ্য জনসাধারণের সত্যটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এর মধ্যেই বিশিষ্ট মানুষেরা—যথা মহাশ্বেতা দেবী, সুজাত ভদ্র, শৈবাল মিত্র, কৌশিক সেন ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁদের স্পষ্ট মতামত জানান, যাতে অবস্থার মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা ও হিংস্রতা প্রকট হয়ে ওঠে।

যৌথ বাহিনীর 'দখল' করা এলাকায় দখলের তিন সপ্তাহে ১৫ জন সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মীকে পুলিশের চর অভিযোগে খতম করলো 'মাওবাদী'রা। একজনও মাওবাদী গ্রেপ্তার করা হল না। বরং মটোরবাইক বাহিনি ঘুরে যাওয়ার পর গাদা-গাদা সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মী পোস্টার দিয়ে দল ছাড়লো। কান ধরে উঠ-বোস করে দল ছাড়লো।

স্থানীয় স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো দখল নিয়ে দিব্বি থাকছিল পুলিশ ও আধাসেনারা। স্কুল বন্ধ, তাই হাজার ছয়েক গরীব ছাত্র-ছাত্রী মিড-ডে মিল থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল।

'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির' ছাতার তলায় বিশাল জনতার উপস্থিতি আমরা দেখলাম ১৯ জুলাই ২০০৯। ১০ হাজার নগ্নপদ লালগড়ের মানুষগুলো যৌথ বাহিনির কাছে গিয়ে দাবি জানিয়ে এলো—স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছেড়ে দাও।

যৌথবাহিনি আগাম খবর পেয়েছিল, অবস্থা খুব খারাপ। জঙ্গলমহলের মানুষ এককাট্টা হচ্ছে। ওদের রুখতে ১৪৪ ধারা জারি করল সরকার। আইন ভাঙলে গ্রেপ্তার ও শাস্তির ভয় দেখালো।

১৪৪ ধারা ভেঙে অন্তত ১০ হাজার গরীব মানুষের মিছিল প্রমাণ করল—মিডিয়ার

খবর একদম ভুল। ছত্রধর আছেন ছত্রধরেই। আর মাওবাদী হল ওই নগ্নপদ গরীব মানুষগুলোই।

যৌথ অভিযান ব্যর্থ, শক্তিবৃদ্ধি মাওবাদীদের : জেলাশাসক

এই কথাগুলোই রাজ্য সরকারকে জানালেন মেদিনীপুরের জেলাশাসক নারায়ণ স্বরূপ নিগম ও মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার মনোজকুমার ভার্মা। ৩ আগস্ট নাগাদ এই রিপোর্ট পেলেন রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব অশোকমোহন চক্রবর্তী

রিপোর্টে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার লিখেছেন, যৌথবাহিনীর এতদিনের অভিযানে কোনও ফল মেলেনি। পুলিশ ও প্রশাসনের প্রভাব বিন্দুমাত্র বাড়েনি। ধরা পড়েনি কোনও কট্টর মাওবাদী। বরং এই অভিযানের পর দ্রুত বেড়ে চলেছে মাওবাদীদের প্রভাব ও সংগঠন। যৌথবাহিনীর অভিযানের আগে যে মাওবাদীদের সংগঠনে ছিল জনা তিরিশ, এই দেড় মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচশ-তে। সার্বিকভাবেই মাওবাদীরা যৌথবাহিনীকে ছাপিয়ে গিয়েছে। লালগড় ছাড়িয়ে গোটা জঙ্গলমহলে তাদের প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে। জঙ্গলমহলের গ্রামবাসীরা মাওবাদী সংগঠনে যোগ দিচ্ছে। মাওবাদীদের সমর্থন জানাচ্ছে গ্রামবাসীরা। অ্যাকশন স্কোয়াডের সাত-আটজন মাওবাদীরাই হাজার নিরাপত্তা বাহিনীকে নাজেহাল করে ফেলেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর আত্মবিশ্বাসও অটুট আছে বলে মনে হচ্ছে না।

এই রিপোর্টে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে আরও ৬ কোম্পানি আধাসেনা পাঠানোর। আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে—মেদিনীপুর সদরে যে কোনও সময় মাওবাদী হামলা হতে পারে সদরের তিনটি থানাতেই। বন্দুক লুটতেই এই হামলা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ভারতে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী পার্টি সিপিআই (এম)

গত ৩২ বছরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে ৪৫ হাজার। তার মধ্যে ৪০ হাজার হত্যা করেছে ফ্যাসিস্ট পার্টি সিপিআই (এম)। নিষ্ঠুরতায় নাৎসি বাহিনীর সমকক্ষ সিপিএম এই বঙ্গে মরিচঝাঁপি, নকশালবাড়ি, সাঁইবাড়ি, কাশীপুর, বরাহনগর, বেলেঘাটা, ধানতলা, বানতলা, ঘোকসাডাঙা, কেশপুর, গড়বেতা, আরামবাগ, চন্দ্রকোনা, মঙ্গলকোট, ছোট আঙারিয়া, খানাকুল, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে বিভৎস সব অত্যাচার চালিয়েছে। তারপরও কেন কেন্দ্রীয় সরকার সিপিআই (এম)-কে নিষিদ্ধ সংগঠন বলে ঘোষণা করছে না? ভবিষ্যতে ওদের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘর বাঁধতে হতে পারে বলে? ব্যক্তি হত্যায় বিশ্বাসী সিপিআই (এম)-কে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষণা করুক কেন্দ্রীয় সরকার।

এত অত্যাচার চালাবার পরও সিপিআই (এম) সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে প্রচারে আসেনি প্রচারমাধ্যমের কৃপায়। এতদিন রাষ্ট্রের কৃপাধন্য বুদ্ধিজীবী ও প্রচারমাধ্যমগুলো আমাদের মগজে ঢুকিয়ে গেছে একপেশে চিন্তা—সরকারের

পুলিশ-সেনা ও শাসকদলের ক্যাডারদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরাও রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এই রাষ্ট্রদ্রোহিরাই সন্ত্রাসবাদী, হোক না তারা ভুখা, নাঙ্গা, পার্টি, সেনা ও পুলিশের অত্যাচারের শিকার।

আমরা স্পষ্টতই সন্ত্রাস ও ব্যক্তিহত্যার বিরুদ্ধে

প্রতিটি প্রগতিবাদী, মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী মানুষই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে মনে করি লাগাতার বঞ্চনা, শোষণ এবং পার্টি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের স্টিমরোলার চালালে শেষ পর্যন্ত একদিন পাল্টা সন্ত্রাস মাথা চাড়া দেবার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

শেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত ব্যক্তিসন্ত্রাস ও ব্যক্তিহত্যা সমাজের ক্ষতিই সাধন করে। সমাজকে সুন্দর করে না। আমরা তাই প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক দল ও সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রকে ধিক্কার জানাই। ঘৃণা ছুঁড়ে দিই।

একটি আদর্শ সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের নমুনা

১৮ জুন ২০০৯। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী 'সন্ত্রাস দমন করতে' লালগড়ে পা রেখেছে। তারপর...

'বর্তমান' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবর, কুলডিহার উষারানি জানিয়েছেন, "শুক্রবার বিকালের দিকে দু'মুঠো ভাত নিয়ে মেয়েটাকে খাওয়াতে বসেছিলাম। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে লাথি মেরে থালা উল্টে দিল পুলিশ। বলে, আমরা নাকি বনপাটি (মাওবাদী)। ভেঙেচুরে তছনছ করে দিল গোটা ঘর। চাল, ডাল, হাঁড়ি, বাসন সব ফেলে দিল কুয়োয়। ইজ্জত নেওয়ার হুমকি দিয়ে গেল।"

কুলডিহা, গোয়ালডাঙা, কাঁকশোল, মালিদা, সরবেড়িয়া, পেয়ারাকুলি, পেঁচাপোড়া সহ প্রায় ৪০টি গ্রামের আদিবাসী ও তপশিলি মানুষদের অভিজ্ঞতা কম-বেশি একই রকম। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মহিলাদের দেহ তল্লাসির নামে শাড়ি তুলে দিয়েছে। বদ রসিকতা করে বলেছে, বর তো ভেগেছে, চিন্তা নেই, আমরাই রাতে আসবো। কুয়োতে বিষ্ঠা ত্যাগ করে জল পানের পথ রুদ্ধ করেছে।

ল্যান্ডমাইন খুঁজতে গ্রামবাসীদের বাধ্য করছে সন্দেহজনক স্থানের উপর দিয়ে হাঁটতে। এমন ব্যবহার যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধেও করে না সভ্য দেশের সেনারা। এটা স্পষ্টতই মানবাধিকার লঙ্ঘণের ঘৃণ্য ঘটনা।

এ কী চলছে? এ তো দেখছি ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা-পুলিশের যুদ্ধ। এরপর কোনও বিদেশী যদি বলেন, তোমাদের দেশ একটি আদর্শ সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র—আমরা কী জবাব দেব?

লা ল গ ড় প্র স ঙ্গে ওঁ রা ব লে ন

খাদ্য, গায়ের জোর নয়

“লালগড় সমস্যার সমাধানের উপায় খাদ্য, গায়ের জোর নয়।

...সরকার যা করছেন, তা ভুল। মানুষ যৌথভাবে লড়াই করছেন কিছু দাবি নিয়ে। তাকে সম্মান করুন।...

এই সরকারের এবার চলে যাওয়া উচিত। এঁরা এসেছিলেন অনেক হই হই করে। কিন্তু এত বছরে এঁরা জঙ্গলের আদিবাসী মানুষদের জন্যে কিছুই করেন নি। রাজ্য বনদপ্তর কন্ট্রাক্টরদের বে-আইনি গাছ কাটায় মদত দিয়েছে, আর তাতে স্থানীয় মানুষের জীবিকার ক্ষতি হয়েছে।...

আদিবাসীদের বি.পি.এল. কার্ড, সোলার বিদ্যুত আর পানীয় জল দিয়ে দেখুন—কী হয়।

এত বছরেও ওরা বি.পি.এল. কার্ড পায়নি। যে চাল, গম ওদের প্রাপ্য, তা কোনদিনই পায়নি। এমনকি গুজরাটেও SEZ এর পাশাপাশি Green Economic Zone গঠিত হয়েছে। এখানে তেমন করা যায়নি কেন?...

সরকারের যে কী অবস্থান কিছুই স্পষ্ট নয়। সমস্যাটা এখানেও SEZ নিয়ে। সরকার হয়ত এখন ভয় পাচ্ছে জিন্দালরা শালবনি প্রজেক্ট এর জন্যে দেয়া টাকা ফেরত চাইবে......।

—মহাশ্বেতা দেবী

পুরো লেখাটা ইংরাজিতে—টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৩ জুন ২০০৯

এখনো খুব দেরি হয়নি, রাজনৈতিক মোকাবিলার জন্যে

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কোন দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে খুব কিছু লাভ হয়না। দলটিকে নির্মূল তো করা যায়ই না, বরং তাতে উল্টোটাই হতে পারে। দলটা আরো দৃঢ়তার সঙ্গে, আরো সংগঠিতভাবে উঠে আসবে। ইতিহাস জানে কম্যুনিস্ট পার্টি যখন নিষিদ্ধ হয়েছিল, তখন আরো বড় ও শক্তিশালী হয়ে সামনে এসে গিয়েছিল।...

একটা জিনিস পরিষ্কার করে নিই—আমি কোনভাবেই খুন বা হিংসার রাজনীতির পক্ষে নই। কিন্তু সরকার কি কখনো ভেবে দেখেছে কেন এই মানুষগুলো এইরকম চরম পথ বেছে নিল? অথবা কেন মাওবাদীরাই বা এত সহজে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারছে? উত্তর হচ্ছে—না।...

গত ৬০ বছরে সরকার শুধু ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে গেছে। এই দরিদ্রতমদের প্রয়োজনের কথা নিয়ে কেউই চিন্তা ভাবনা করেনি...।

দুর্ভাগ্যবশত সরকার সবসময়েই অতি সরলীকরণ করে প্রথমে শক্তিপ্রয়োগ করে, তারপর অবস্থা যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পিষে ফেলার চেষ্টা চলে।...

সরকার মনে রাখেনা যে মাওবাদীরা কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি নয়, তাদের কাশ্মীর বা পাঞ্জাব এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। এরা সত্যিই দরিদ্র, বঞ্চিতদের অধিকারের স্বার্থে লড়ছে। তাদের আদর্শটা সৎ কি না এটাই দেখা দরকার।

এখনো খুব দেরি হয়নি। আলাপ আলোচনা শুরু করাই যেতে পারে। সরকারই জিনিসটা বাড়তে দিয়ে শেষমেশ এদের ক্ষোভ কে একটা সশস্ত্র বিপ্লবে পর্যবসিত করে ফেলেছে।

—শৈবাল মিত্র

পুরো লেখা ইংরাজিতে—টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৭ জুন ২০০৯

লালগড় ত্রাণ চায়না, চায় অর্থনৈতিক ক্ষমতা

...“অভিযোগের কারণগুলোকে দূর করতে পারলে লালগড়ের অধিবাসীরা নিজেরাই মাওইস্টদের তাড়িয়ে দেবে।... কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রথমে এটা বোঝা উচিত যে লালগড়ের মানুষ ত্রাণ চায়না, ওরা চায় অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাতে ওরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। আর এটা আসবে রাস্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহের মধ্যে দিয়ে। যেগুলো আমরা কলকাতার মানুষরা খুব স্বাভাবিক মনে করি, সেগুলো থেকে ওরা এতদিন বঞ্চিত থেকে গেছে। লালগড়ের মানুষের হৃদয় জয় করতে কয়েকটা রুটির টুকরো ছুঁড়ে নয়, ওদের অবস্থার উন্নতির আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে।...

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি

দমন-নীতি দিয়ে লালগড় সমস্যার সমাধান করা যাবেনা

লালগড় সমস্যাটা সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের মত জমি অধিগ্রহণ বা উন্নয়ন নিয়ে তৈরি হয়নি। এটা সম্পূর্ণ ভাবে পুলিশি অত্যাচারকে ঘিরে। এই আন্দোলন রাজনৈতিক—আইনের রক্ষাকারীদের আইন ভাঙার বিরুদ্ধে, স্বাভাবিক জীবনের দাবিতে।...

মহিলাদের উপর শারীরিক অত্যাচার, তাদের মানসিক অবমাননা ইত্যাদি কারণে আদিবাসীদের প্রধান দাবি ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের এস.পি.কে ক্ষমা চাইতে হবে। সরকার তার স্বভাবসুলভ ভাবেই এই ক্ষমা চাওয়াতে রাজী হয়নি। পুলিশদের এই অন্যায় করে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই আদিবাসীদের ক্ষোভ।...

প্রশ্ন হচ্ছে এই মামুলি দাবির বিরুদ্ধে, সামান্য কটা বন্দুকধারি মাওবাদীর বিপরীতে—একেবারে যৌথ বাহিনী, তাদের বিশাল অপারেশন কি সত্যিই যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য বা মানানসই?...

অস্ট্রেলিয়ার এক রিসার্চ স্কলার জানাচ্ছেন—সন্ত্রাস দমনে সন্ত্রাসের মূল কারণগুলোকে চিহ্নিত করতে হয় প্রথম। অথচ বামফ্রন্ট সরকার এখনো প্রচলিত মান্ধাতার আমলের কৌশল ব্যবহার করছে...

দেখা যাচ্ছে গত ১০০ বছরে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সরকার উগ্রবাদিদের চেয়ে ৪৫ গুণ বেশি নরহত্যা করেছে।...

এই ধরনের মাওবাদী বা যে কোন গণঅভ্যুত্থানের পিছনে স্থানীয় মানুষের বিশাল উপস্থিতি থাকেই। তাই এইসব ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমাজ, সংস্কৃতি, আদর্শ ইত্যাদি বোঝার দরকার থাকে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে।...

আজ যা দরকার তা হল সমস্ত রকম অহিংস ব্যবস্থা যাতে কথোপকথন চালান যায়। জনগণের স্বার্থে।

—সুজাত ভদ্র

পুরো লেখাটা ইংরাজিতে টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৬ জুন ২০০৯

Predictions which make you win...

Statesman News Service

KOLKATA, May 14: A city based NGO has announced hat it would reward any istrologer able to rightly predict the results of the Lok abha polls, with Rs 25 lakh.

The NGO, Science and Rationalist's Association of ndia, has challenged strologers across the country to predict India's future.

Predictions regarding victory margins of Mrs Sonia Gandhi, Mr Lal Krishna dvani, Miss Mamata anerjee, Mr Lalu Prasad nd Mr Ram Vilas Paswan ~ ill also be considered. Mr rabir Ghosh, general secretary of the NGO said that astrologers make false propaganda and as soon as the results are declared, they cleverly claim that it was their prediction that had matched the reality.

He also said that astrologers swindle and they even go to the extent of taking bulk money from political leaders, just to give them assurances of winning.

Mr Ghosh, condemning the treacherous nature of astrologers, said that astrologers should be punished for giving false assurances to people.

The NGO has thus announced a reward of Rs 25 lakh and has dared astrologers to predict it right. They have also claimed that they were ready to close down their organisation, should any astrologer accept the challenge and is able to predict the election results correctly. Mr Ghosh said, astrologers had even claimed that the Trinamul Congress would come to power after the 2004 Assembly polls.

When contacted, astrologer Khana ma denied allegations of false propaganda and said that her predictions were always right.

Yesterday's readings:
Max temp up to 5.30 p.m. was 33.3 (-3)
Min temp up to 8.30 a.m. was 24.1 (-2)

Relative Humidity: Max 98%; Min 62%
Relative humidity at 8.30 a.m.: 93% (+20)
and at 5.30 p.m.: 76% (+10)
Rainfall: 34.4 mm

Hooghly river tides at Garden Reach:
May 15: High water 4.20 am 4.32 mt ● May 15: Low water 12.29 pm 1.85 mt
May 15: High water 4.40 pm 4.55 mt ● May 16: Low water 1.00 am 1.97 mt

ফি চা র

"টুনটুনির গল্প"

সুমিত্রা

'টম এ্যান্ড জেরি' কার্টুন দেখতে বাচ্চা থেকে বুড়ো কার না ভাল লাগে! ছোট্ট ইঁদুরছানা যে কিনা বরাবরই বিড়ালের শিকার বই কিছু না, সেই জেরি বুদ্ধিবলে তার ছোট্ট খুদে চেহারা আর চালাকি দিয়ে নাজেহাল করে ছেড়ে দেয় হোঁৎকা হুলো টমকে। যতই টম বোকা বনে, ততই হো হো হাসিতে ফেটে পড়ে দর্শক।

আর মনে পড়ে সেই টুনটুনিকে। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের টুনটুনির গল্পে যে ছোট্ট দুষ্টু পাখিটা রাজার পেছনে লাগে। এমনই লাগে যে রাজার পাগলা হবার জোগাড়। এমনই বেয়াড়া, এমনই ফাজিল, নাছোড়বান্দা পাখিটা যে রাজা যাই করুন না কেন, তাঁকে ঠাট্টার পাত্র করে ছাড়ে। রাজা রাগ করেন, সামান্য একটা টাকার জন্যে পাখিটাকে ধরে আনেন। মোট কথা রাজা কিছুতেই টুনটুনিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। যাক গে বলে ছেড়ে দিতে পারেন না। পাত্তা না দিয়ে থাকতে পারেন না। শেষমেশ একটা ইগোর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

রাজা ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন, রানীদের চোখে ধুলো দিয়ে সে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। আর পাখিটাও তেমনি। সমানে রাজার জানলার বাইরে সভার মাঝখানে যেখানে সেখানে রাজাকে 'টিজ' করতে থাকে। ঠাট্টা। তাই রাণীদের হাত থেকে পালিয়ে যাবার পর—

"এক টুনিতে টুনটুনালো,
সাত রানীর নাক কাটালো"

তারপরে শেষ দৃশ্যে রাজারও নাক কাটা যায়। যদিও রাজার নাক কাটা খুবই অন্যায় কথা—রক্ত ঝরা ছবি খুবই খারাপ লাগার কথা দেখতে, তবু কিন্তু কোনও এক আশ্চর্য কারণে শেষ দৃশ্যে শিশু ও তার মা বা দাদু যিনিই পড়ুন না কেন গল্পটা, রাজার অবস্থা দেখে তৃপ্তির হাসিতে তাদের মুখ ভরে যায়। টুনটুনি উড়ে যায় দূরের কোন দেশে।

এখানে মজা লাগার আসল কারণটাও সেই একই—টুনটুনির ক্ষুদ্রতা এবং তার বুদ্ধিমত্তা। জেরির মতই অনেকটা। কোথায় একটা ছোট্ট পাখি আর কোথায় দোর্দন্ডপ্রতাপ রাজা, তাঁর মন্ত্রী, সান্ত্রী, সভাসদ আর সাত রানি। শুরুতে একটা মাত্র সোনার টাকা চুরি করেছিল সে। তাও অর্থের লোভে নয়—সুন্দর চকচকে একটা টাকা তার ঘরে রাখার শখ হয়েছিল। সেই থেকে গন্ডগোলের সূত্রপাত।

আজ ন দিন হল লালগড়ে অভিযান হচ্ছে। ওখানে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদীরা লুকিয়ে রয়েছে যারা মাইন বিস্ফোরণ ঘটায় মাঝে মধ্যে। পুলিশ প্রশাসনকে হেনস্থা করার জন্যই ঘটায়। অবশ্যই সেটা অন্যায়, অনৈতিক, বেআইনী। কিন্তু অস্বাভাবিক না। দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, টি ভি, কাগজের ছবি, কলকাতা শহরের নানান গল্প শুনে যখন তারা বোঝে যে ভীষণ ঠকে গেছে তারা এতদিন, তখন তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ জমা হয়। তারা খেটে খাওয়া মানুষ, অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে। কিন্তু তার উপর অপমান, দুর্ব্যবহার, অত্যাচার? এগুলো কেন সহ্য করবে তারা? তারা তো আর কিছু চায়নি—নিজেদের মত আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। আচ্ছা, মনে আছে দিল্লীতে কনট প্লেসে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল ২০০৮-এ? বেশ কয়েকজন নিরীহ সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ মারা গেছিলেন। তখন কি কনট প্লেসের অভিজাত এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশী ধরপাকড় করেছিল পুলিশ? এমনি এমনি আন্দাজে যে কোনও বাড়ির দরজা ভেঙে কমবয়সীদের ধরে নিয়ে গেছিল? এমনকি যেসব বাড়িতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি, সেখানেও চলে আসার আগে গৃহস্থদের দু'চার ঘা লাঠির বাড়ি মেরে, জিনিসপত্র নষ্ট করে, তাদের খাবার-দাবার ধ্বংস করে, তাদের জলের ট্যাঙ্কে পেচ্ছাপ করে, মেয়েদের ইজ্জত নেবার ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল? না, যায়নি। কারণ তারা যে সম্ভ্রান্ত। কনট প্লেস দিল্লীর অভিজাত এলাকা। লাখপতি, কোটিপতি ছাড়া কথা নেই। হয়ত ওখানেই কোনও বাড়িতে আতঙ্কবাদী লুকিয়ে ছিল। কিন্তু নিশ্চিত খবর ছাড়া পুলিশ ঐসব হোমড়া চোমড়াদের হেনস্থা করবে কেন?

এটাই তো মজা। এইসব লালগড় ফালগড়ের আদিবাসীরা মানুষ না। অন্য একটা প্রজাতি। রোগা, কালো, না খেতে পাওয়া—ওদের আবার মান ইজ্জত! ঠেঙিয়ে মেরে ফেললেও কিস্যু হবে না। একটু ঔদ্ধত্য দেখালে গা পিত্তি জ্বলে যায়। মেরে হাড়গোড় ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে। তাই দেয়ও। সদ্য মা হওয়া, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদেরও ছাড়ে না।

এইসব গল্প পড়তে পড়তে, টি.ভি-তে ছবি দেখতে দেখতে, এই পুলিশ প্রশাসক সেনাদের উপর অদ্ভুত এক অশ্রদ্ধা, ঘৃণা তৈরি হয়। আর লালগড়ের মানুষগুলোর কথা ভাবলে অবাক লাগে। এত দারিদ্র, এত বঞ্চনার পরও এত আত্মসম্মানবোধ?

আসলে খুব গরীব হলেও শহরের বস্তিবাসীদের সঙ্গে ওদের একটা মূলগত পার্থক্য আছে। শহরের ঘিঞ্জি পরিবেশ, গাদাগাদি করে থাকা, দুর্নীতির প্রলোভন তাদের খুব সহজেই নষ্ট করে দেয়। তাদের মেজাজও খিটখিটে, কথায় কথায় মারামারি, চুলোচুলি। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে খেটেখাওয়া আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবই আছে। তারা কেউ উড়ে আসেনি, আকাশ থেকে পড়েনি। তারা ভূমিপুত্র, তাদের আত্মসম্মানবোধ এমনই, না খেয়ে থাকলেও ভিক্ষে করবে

না। ওদের সততা, আত্মমর্যাদাবোধ, কর্মক্ষমতা, শারীরিক সহ্যক্ষমতা শহরের মানুষকেও লজ্জা দিতে পারে। এটা বোঝার ক্ষমতা নেই আমাদের সেনা-পুলিশ-প্রশাসনের। মানুষ হিসাবে তারা এতটাই নিম্নশ্রেণীর।

তাই লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে BSF, CRPF, ল্যান্ডমাইন বিশেষজ্ঞ, বম্বস্কোয়াড, র‍্যাফ, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী—বন্দুক, এ. কে. ফর্টি সেভেন, ই. এফ. আর, স্ট্র্যাকো, মেশিন গান, মাইন নিরোধক সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে নেমে পড়ে বীরপুঙ্গবেরা। 'মাওবাদীরা' কোথায় লুকিয়ে আছে জানি না। জানি না এই সব স্থানীয় বাড়িরই রাগী পুরুষরা ওদের দলে নাম লিখিয়েছে কি না। কিন্তু 'মাওবাদী' দমনের বিশাল বাহিনী দেখলে অবাক লাগে। দিনের পর দিন তারা এগোতে পারে না, গরমে অসুস্থ হয়। একজন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

ওদিকে পুলিশের গুলিতে গোবিন্দ দাঁ নামে এক আদিবাসীও মারা যান। মৃত পুলিশের পরিবার দু'লক্ষ টাকা পাবে। গোবিন্দবাবু নিরীহ, নিরস্ত্র কি না জানা যায়নি। তার ছবিও বেরোয়নি। কিছু ক্ষতিপূরণের কথা স্বপ্নেও তার পরিবার ভাবছেন না। তিনি যে আদিবাসী।

যাই হোক ন দিন হল, 'মাওবাদী'দের দেখা নেই। পুলিশ নাজেহাল। মাঝে মাঝেই নতুন ব্যাটেলিয়ান আসছে। পুরনোরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। তাদের বিশ্রামের জন্য বদলি আসছে। তারা এলোপাথাড়ি অত্যাচার করছে, অপমান করছে। কিন্তু বাগে আনতে পারছে না কিছুতেই। বেশি এগোতেও পারছে না।

এর মধ্যে কাদাশোল দখল হল। শেষপর্যন্ত হয়ত নিহত হবেন অনেকেই। 'মাওবাদী' সন্দেহে গ্রেপ্তারও হবেন অজস্র। কে সত্যি সশস্ত্র 'মাওবাদী' আর কারা ভুখা, রাগী যুবক—পুলিশকে ভালবাসতে পারেনি, শ্রদ্ধা করতে পারেনি—মা, বৌ-এর অসম্মান সহ্য করতে পারেনি, আমরা হয়ত জানতেও পারব না কোনদিন। কিন্তু যতই মারুক, ধরুক ওদের স্পিরিটকে মারতে পারবে না। দমন করতে পারবে না ওদের ভিতরের আগুন। সহ্য শক্তি ও বশ্যতা স্বীকার না করে লড়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে স্যালুট জানাতেই হয়। শেষমেশ রাজার নাক কাটা গেলে—উড়ে পালাতে পালাতে টুনটুনিটা আবার ঠাট্টা করবে—বলবে,

"নাক কাটা রাজা রে,
দেখ্ তো কেমন সাজারে।"

তখন আমরা যারা তেমন লড়তে পারি না, তারা অন্তত খুব একচোট হাসতে তো পারবো!

২৭ জুন, ২০০৯

প্র চ্ছ দ কা হি নী

‘বে-আইনি’ আইন করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তীব্র করা যায় শুধু

প্রবীর ঘোষ

আইন হোক সবার জন্যে সমান, আইন হোক নাগরিক স্বার্থে

কিছু স্বেচ্ছাচারি, সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র তাদের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখতে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যের মুখোশ পরে। রাষ্ট্রসংঘ সদস্য দেশগুলোর নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে একাধিক সনদ সাধারণ সভায় পেশ করেছে। সদস্য দেশগুলো সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে। এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের অলঙ্ঘনীয় (Nonderogable) আইনকে লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রসংঘের আইন ও চুক্তি ভেঙে ‘বে-আইনি’ আইন তৈরি করেছে। এইসব জঘন্য অপরাধী দেশগুলোর মধ্যে ভারতও আছে। ভারত সরকার অন্ততঃ দু-ডজন এই ধরনের unlawful law তৈরি করে বসে আছে। সরকার জবাব হিসেবে একটি কথাই আওড়ে যায়—‘জরুরি পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী আইনগুলো তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে’।

যে দল যখন কেন্দ্রের শাসক-গদীতে বসেছে, তখনই সেও ‘বে-আইনি’ কালাকানুন টিকিয়ে রেখেছে বা তৈরি করেছে। দুর্নীতিপরায়ণ আর সব দেশের মতই আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীও চায়, বাড়তি ক্ষমতা, বে-আইনি ক্ষমতা। গরিব, দারিদ্রসীমার নিচের মানুষের সংখ্যাই এদেশে বেশি। মধ্যবিত্তের ও উচ্চবিত্তের সংখ্যা শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ। এই শতকরা ১৮-২০ ভাগ মানুষকে তুষ্ট করেই সাধারণভাবে এদেশের সরকার দিব্বি টিকে থাকে। মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাওয়া গরিব মানুষদের সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে মাথা থেঁতলে দেয়। এটাই হল এদেশের ‘কুর্শি-রাজনীতি’।

পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস বলে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের থেকেই উঠে আসা হাতে গোনা কিছু মানুষ সাম্যের স্বপ্ন দেখায়। কমিউন ও স্বয়ম্ভর গ্রামের তত্ত্ব প্রয়োগ করতে শেখায়। শোষণ চালু রাখার সমাজ কাঠামোকেই ভেঙে ফেলতে চায়। এই সাম্য-পাগলদের ঝাড়ে-বংশে শেষ করতেই নানা কালাকানুনের উৎপত্তি। “বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিতে দেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সন্ত্রাসবিরোধী নানা আইন তৈরি”—এসবই গল্প কথা। শোষণ প্রক্রিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতেই এইসব গপ্পো ও আইনের সৃষ্টি। বাস্তবের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন, কোনও কড়া কানুন দিয়ে কখনই সন্ত্রাস বন্ধ করা যায়নি এ দেশে।

যত কড়া আইন তৈরি হোক না কেন, দেশে সর্বব্যাপী দুর্নীতি থাকলে দুর্নীতিপরায়ণদের সহযোগিতায় সন্ত্রাসও গতিশীল থাকে। বিদেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা ট্রান্সফার করে দিলে ভিআইপিরা দেশের সর্বনাশ করতে এক পায়ে খাড়া। তাই তো POTA ('The Preventation of Terrorism Act 2000') এর মতো জব্বর কালাকানুন চালু থাকা সত্ত্বেও সংসদভবনে হামলা হল।

যাদের হাতে সুরক্ষার দায়িত্ব ছিল, তাদেরই কর্তাব্যক্তিদের ঘুষ দিয়ে সুরক্ষা ব্যূহ ভাঙতে হয়। হ্যাঁ, এটাই নিয়ম। এই নিয়ম ধরেই পাকিস্তানের শত্রুপক্ষ বেলুচিস্থানে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম এবং শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের পাক সফরের সময় বিস্ফোরণ পর্যন্ত ঘটিয়েছে।

একটা দেশের দুর্নীতির বাস্তব অবস্থা ভালমতো জানা থাকলে একটা বড় মাপের সন্ত্রাসবাদী দলের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্তদের হদিশ পাওয়া সম্ভব হয়।

১৯৯৩তে সিরিয়াল ব্লাস্ট হয়েছিল মুম্বাইতে। প্রায় পৌনে-তিনশো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ব্লাস্টে জড়িত অপরাধীদের শাস্তি ঘোষিত হয়েছে ২০০৮ সালে। শাস্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছে পুলিশ এবং শুল্ক দপ্তরের কিছু পদস্থ অফিসার ও তাদের অধস্তনরা। এইসব সরকারি সুরক্ষা কর্মচারীরা অর্থের বিনিময়ে আরডিএক্স-এর প্যাকেট নির্দেশিত জায়গাগুলোতে পৌঁছে দিয়েছিল।

আমেরিকায় ২০০১ সালের পর এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি। না হওয়ার কারণ—সবার জন্যেই আইন। বিশেষ সুবিধাভোগী এমন কোনও শ্রেণি নেই যাদের জন্য আইন এড়িয়ে চলার প্রথা চালু আছে। ওখানে প্রেসিডেন্টকেও ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হয়। কোনও রাজ্যের গভর্নর তাঁর রাজ্যের এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ধরতে গেলেও নিখুঁত চেকিং-এর মধ্য দিয়েই তাঁকে যেতে হয়। একই নিয়ম মেনে চেকিং-এর পর প্লেনে ওঠেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

আমেরিকার কিছু মহৎ গুণ আছে। সেই গুণাবলীই আমেরিকাকে অনেক বিষয়ে এক নম্বরে পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের দেশ আমেরিকার গুণগুলো নিতে পারেনি। নিয়েছি দাদাগিরি করার স্বভাব। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর দাদাগিরি করে চলেছি। আমরা বিশেষ সুবিধাভোগীদের আইনের ঊর্ধ্বে রেখেছি। সেই সুযোগে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে।

জুলাই ২০০৯-এর ঘটনা। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম আমেরিকা যাত্রা বাতিল করে ফিরে এলেন। ভারতের মিডিয়া হৈ-চৈ ফেলে দিল—আমেরিকান প্লেন কোম্পানি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে তথা ভারতকে অপমান করেছে। কী ভাবে অপমান করেছে?

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে চেকিং-এর পর প্লেনে উঠতে হবে জানিয়েছে।

ভারত জুড়ে মিডিয়া ও রাজনীতিকদের তোলপাড়—ওই প্লেন কোম্পানিকে ক্ষমা চাইতে হবে। প্লেন কোম্পানি ক্ষমা চেয়ে নিল।

ইউএসএ সরকারের তরফ থেকে ভারত সরকারকে জানাল—আমাদের দেশে সবাইকেই নিয়ম মানতে হয়। এদেশের রাষ্ট্রপতিও চেকিং করিয়ে প্লেনে ওঠেন।

নভেম্বর ২০০৯ মুম্বাই হামলার পর তদন্তের ভার ভারত সরকার তুলে দিয়েছিল আমেরিকার 'ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন' (FBI)-এর উপর। তদন্তের ব্যাপারে এফবিআই এবং ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এর বিশাল নাম-ডাক।

১০ জুলাই ২০০৯, শুক্রবার এফবিআই তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে ভারত সরকারের কাছে। তাতে বলা হয়েছে দিল্লি ও মুম্বাইয়ের ৩০ জন ভিআইপি ও ভিভিআইপি-রা হামলার সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সন্ত্রাস চলাকালীন কথোপকথন চালিয়েছে। ফোনগুলো করা হয়েছিল ভিআইপি-দের ২৩টি মোবাইল ফোনে এবং ১২টি ল্যান্ড লাইনে। ওইসব ভিআইপিদের ফোন থেকে ফোনও পাচ্ছিল ১০ জন হামলাকারী। হামলাকারীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করছিল ওইসব ভিআইপি-দের ফোনের সাহায্যে।

২৩ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত ওইসব ভিআইপি-দের ফোন থেকে ৯১টি কল করা হয়েছিল।

তদন্ত রিপোর্টে প্রতিটি ফোনে কোন কোন হামলাবাদীদের তরফ থেকে কখন ফোন এসেছিল এবং কখন ফোন গিয়েছিল, তার তালিকা রয়েছে।

ভিআইপি, রাজনীতিক, সেনা-পুলিশ-শুল্ক অফিসার, খেলোয়াড়, অভিনেতা, প্রশাসক—ওদের কী হবে এবার? যারা এই হামলায় অংশ নিয়েছিল, তারা তো FBI Report-এর খবর পেয়ে কুলকুল করে ঘেমে একশা। শেষে কি যাবজ্জীবন...

এত বিশাল খবর, কিন্তু ভারতীয় সামান্য কিছু পত্রিকায় খবরটা প্রকাশিত হল! কেন মিডিয়াগুলো এত বড় খবর চেপে দিল? কাদের স্বার্থে? যারা খবরটা চাপতে চায়, পারলে কেসটাই চাপতে চায়—তাদের স্বার্থেই কি চাপা হয়েছে বিশাল অঙ্কের উৎকোচের বিনিময়ে? শেষ পর্যন্ত কাসব শেষ হবে না তো জেলেই? অথবা

কাসবের কেসটায় যবনিকা টানতে কাসবকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করাবে না তো ভিআইপি-রা?

২০ জুলাই তা-ই হল! প্রতিটি দৈনিকে প্রথম পৃষ্ঠায় পাতা জুড়ে খবর—কাসব ওর অপরাধ 'কবুল' করেছে আদালতে। মুম্বাইয়ে বিশেষ আদালতে বিচারক এমএল তহলিয়ানির কাছে অপরাধ স্বীকার করতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরল।

বিচারক দুঁদে মানুষ। FBI-এর তদন্ত রিপোর্ট চার্জসিটের সঙ্গে জুড়ে তাঁর বিশেষ আদালতেই পেশ করা হবে, জানেন বিচারক। তিনি কাসবকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনও চাপে ভেঙে পড়ে তুমি কি আজ অপরাধ স্বীকার করছো? আগে তো স্বীকার করনি?

বিচারক জানিয়ে দিলেন, কাসব অপরাধ স্বীকার করলেও তিনি এখনই শাস্তি ঘোষণা করে কেসটাকে শেষ করে দিচ্ছেন না। কেস চলবে।

তার মানে—আরও নাটক অপেক্ষায় আছে!

মুম্বাই বিস্ফোরণে ভিআইপি-দের যুক্ত থাকার ঘটনা জেনে অনেকেই হতবাক। কিন্তু অবাক হননি 'গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি' গ্রন্থের পাঠকরা। তাঁরা পত্রিকায় প্রকাশের ৬ মাস ৭ দিন আগেই ভিআইপি-দের যুক্ত থাকার খবরটা জানতেন। কারণ এদের যুক্ত থাকার কথা বিস্তৃত ভাবে লেখা ছিল গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ১৭, ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠায়।

মুম্বাই হামলা সংগঠিত হওয়া নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ওখানে তুলে আনা হয়েছিল :

১। আর ডি এক্স ১০০ কেজি, কয়েকশো নানা ধরনের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, কয়েক বাক্স গ্রেনেড নিয়ে গুজরাট উপকূল ধরে মুম্বইতে এসেছিল সন্ত্রাসবাদীদের জলযান।

২। তামাম ভারতের অজস্র দৈনিক পত্রিকা ২৮ নভেম্বরের সংস্করণে লিখেছে—সন্ত্রাসবাদীদের জলযানটির মালিক একটি বিশাল মাপের তেল সংস্থা। এই তেল সংস্থাই গুজরাট থেকে মুম্বই জলপথ রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে।

৩। মুম্বই থেকে গুজরাট জলপথ রক্ষার দায়িত্ব ছিল তেল সংস্থাটির বিশেষ রক্ষী বাহিনীর পাশাপাশি উপকূল রক্ষী বাহিনীরও। তারপরও কী ভাবে বিনাবাধায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকলো কম করে জনা ২৫ সন্ত্রাসবাদী?

৪। ২৮ নভেম্বরের খবরের কাগজগুলো আরও জানাচ্ছে, গোটা প্রক্রিয়ার সময় অর্থ দিয়ে নজরদারি বাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কেনা হয়েছিল। এই অভিযোগ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের। অর্থাৎ 'ইনটেলিজেন্স ব্যুরো' ও 'র'-এর।

৫। একই দিনে আরও সংবাদ সেনাবাহিনী, নৌসেনা, উপকূল রক্ষী বাহিনী, গোয়েন্দা, পুলিশ, শুল্ক দপ্তরের রক্ষী—সবার নজর এড়িয়ে প্রায় ২৫ জন জঙ্গি এই বিপুল পরিমাণ একে-৪৭ রাইফেল, গ্রেনেড, বিস্ফোরক নিয়ে ঢুকে পড়ল, এটা বাস্তবে অসম্ভব বলেই মনে করছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

৬। মুম্বই, পোরবন্দর, কলকাতার কিছু মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ করেছে। যেমন—সেনা, নৌসেনা, উপকূল রক্ষী বাহিনী, গোয়েন্দা ও শুল্ক দপ্তরের পদস্থ অফিসারদের টাকার বিনিময়ে নিজেদের দলে টেনেছে। এদের কেউ অস্ত্র বিস্ফোরক ঢুকতে দিয়েছে। কেউ সে সব নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে বিস্ফোরক, অস্ত্র ইত্যাদি পৌঁছে দিয়েছে।

৭। ভারতে গোয়েন্দা দপ্তরের চোখ এড়িয়ে কোনও অপরাধমূলক কাজ করা অসম্ভব। প্রতিটি থানার অধীনে থাকে প্রচুর 'ইনফরমার'। এইসব ইনফরমাররা সাধারণ ভাবে অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি পাড়ার, প্রতিটি মহল্লার, প্রতিটি ঝোপড়পট্টির সব খবর ওদের জানতেই হয়। কে নতুন চেহারা ঢুকল, কী অপরাধ ঘটতে চলেছে—এসবের আগাম খবর থানায় জানাতে হয়। বিনিময়ে টাকা তো মেলেই, সঙ্গে অপরাধীদের কাছ থেকে পুলিশি-তোলার হিস্সাও মেলে। ছোটখাট অপরাধ করলে ছাড় পাওয়া যায়।

এমন একটা 'সূক্ষ্ম নেট-ওয়ার্ক' থাকার পরও এমন একটা বিশাল মাপের সংগঠিত অপরাধ ঘটতে যাওয়ার খবর গোয়েন্দাদের জানা ছিল না—এটা অসম্ভব। কম-বেশি মাস দুয়েক ধরে সন্ত্রাসের কাজ পরিকল্পনা মাফিক 'দিয়ে-থুয়েই' এগিয়েছে এবং অবিশ্বাস্যও বটে। কলকাতা থেকে প্রচুর সেল ফোনের সিমকার্ড জোগাড় করে জায়গা মতো পৌঁছে দিয়েছে পুলিশ।

৮। তাজ, ওবেরয়ের মতো ফাইভ স্টার, সেভেন স্টার হোটেলের সিকিউরিটি চেকিং খুবই কড়া। টাকা-পয়সা, গাড়ির চাবি ইত্যাদি মেটালের যা কিছু সঙ্গে থাকে, সে সবই একটা ট্রেতে রাখতে হয়। মেটাল ডিটেকটর চেকিং পেরিয়ে ঢোকার পর ট্রে-র জিনিস ফেরত পাওয়া যায়। এই অবস্থায় এত বিশাল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছল কী করে?

এখানে একটা 'বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো'র গল্প আছে। এইসব হোটেলেও সবার ঠিক মত চেকিং হয় না। বলতে কী-চেকিংই হয় না। কাদের চেকিং হয় না? পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ইত্যাদি আই পি এস অফিসারদের, মন্ত্রী ও আমির-শাহরুখ-শচিনের মতো সেলিব্রিটিদের চেকিং হয় না। এইসব মাল-পত্র নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের পক্ষেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যাদের নিখুঁত চেকিং-এর মধ্য দিয়ে যেতে হয় না।

আন্তর্জাতিক স্তর থেকে প্রবল চাপ আসায় কখনও-কখনও সরকার পিছু হটেছে। 'কালাকানুন' বাতিল করেছে। যেমন 'দ্য টেররিস্ট অ্যান্ড ডিসরাপটিভ অ্যাকটিভিটিস (প্রিভেনশন) অ্যাক্ট, ১৯৮৭ (টাডা)। বেয়াদপ নাগরিকদের শায়েস্তা করতেই এই ভয়ংকর আইন তৈরি হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর রিপোর্ট দিল, দেশব্যাপী এই কানুন চালু করায় জনবিদ্রোহের অবস্থা তৈরি হচ্ছে। আইনটি বাতিল করাই সঙ্গত। ১৯৯৫-এর মে মাসে আইনটি বাতিল হয়। 'দ্য প্রিভেনশন অফ টেররিজম অ্যাক্ট, ২০০০' (পোটা) এমনই একটা কালাকানুন। সারা ভারতে চালু থাকা এই আইন জনচাপে ২০০৪-এর ২১ সেপ্টেম্বর বাতিল করা হয়।

কেন্দ্র বেশ কিছু রাজ্যে চালু রেখেছে অত্যন্ত অমানবিক ও ভয়ংকর কিছু আইন। 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট ১৯৫৮,' (AFSPA) এমনই একটি আইন যা পূর্বভারতে ও কাশ্মীরে আজও চালু রয়েছে। ভারতবাসীরা আজও একাত্ম হতে পারেনি বলেই চালু রয়েছে।

২৪ আগস্ট ১৯৯৪ সাল। সেই সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজেশ পাইলট সংসদে জানালেন, টাডায় ধৃতের সংখ্যা ৬৭ হাজার। ৭২৫ জনের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ই ছিল টাডার শিকার।

পোটার অবস্থাও ছিল একই। 'পোটায় বন্দিদের মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যাই ছিল বেশি। 'পোটা' বাতিল করার সময় ২০০৪ সেপ্টেম্বরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বিল পেশ করেন। তাতে জানান,

অর্থাৎ চাপে পড়ে স্বীকার করলেন আইনটির ব্যাপকভাবে অপব্যবহার হয়েছে। শুধুমাত্র ঘুষ খেতে, লুঠতে, ইজ্জত লুটতে এইসব কালাকানুনের অপব্যবহার হয়েছে।

২৬ নভেম্বর ২০০৮ মুম্বাই হামলা হল। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নড়বড়ে

চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল! সমস্ত সন্ত্রাসবাদী নির্বাচননির্ভর রাজনৈতিক দল হৈ-হৈ করে উঠল—সন্ত্রাসবাদ দমনে আরও কড়া আইন চাই।

মুম্বাই হামলার ২০ দিন পরে সংসদে একটি বিল পেশ হল। বিলটির নাম 'Unlawful Activities Prevention Act (Amendment) 2008', সংক্ষেপে 'UAPA 2008' বিল। লোকসভায় ও রাজ্যসভায় বিলটি প্রায় বিনা আলোচনায় গৃহীত হল। রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর দিতেই বিলটি আইন হয়ে গেল।

দেশের প্রচলিত আইনে আছে বিচারাধীন আসামীকে সর্বাধিক ১৫ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখা যায় (Sec 43D)।

বর্তমান UAPA 'আইন' অনুসারে বিনা বিচারে ১৮০ দিন আটক রাখতে পারে।

বিদেশিদের বিনা বিচারে আজীবন আটক রাখা যেতে পারে।

* সাক্ষের বয়ান ও পরিচয় জানান হবে না বিচারাধীন আসামীকে।

অর্থাৎ সাক্ষী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল, এবং সাক্ষীর পরিচয় না জানলে সাক্ষীকে জেরা করার সাংবিধানিক অধিকার থাকলো না। অর্থাৎ বানানো সাক্ষী হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

* একজন সাংবাদিক তাঁর সংবাদের 'সোর্স' জানাতে বাধ্য থাকবেন।

একজন আইনজীবী তাঁর মক্কেলের যাবতীয় গোপন তথ্য জানাতে বাধ্য থাকবেন।

* অত্যাচারী পুলিশদের পক্ষে আইনটিতে বলা হয়েছে—ধরেই নেওয়া হবে একজন পুলিশ তদন্তকারী অফিসার সততার সঙ্গে শুভ বিশ্বাস নিয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না।

* কোনও ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে সহযোগিতা বা প্ররোচিত করলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হবে। এক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার বা সংস্থার যদি মনে হয়—লোকটির উগ্রপন্থী কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্য ছিল, তাহলেই গ্রেপ্তার করা যাবে।

এই কালাকানুন বাতিল করতে বাধ্য করতে পারি আমরাই। আমরা যেন 'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে' করে বসে না থাকি। গোবর একদিন ঘুঁটে হবেই এবং তখন পুড়তেই হবে—এটা মনে রাখাটা জরুরি।

এই লেখাটা অবশ্যই দেশের স্বার্থে, দেশের জনগণের স্বার্থে একটি ইতিবাচক লেখা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলোর চোখে নেতিবাচক লেখা হতেই পারে। আপনি কী বলেন?

—সম্পাদক মন্ডলী

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

একটি সুমহান কৃষি বিপ্লবের পরিচিতি

সুমন সাধুখাঁ

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গবাসীগণ, আমি আজ এসেছি একটি বৃহৎ সুমহান কর্মযজ্ঞের সাথে আপনাদের পরিচয় করাতে। যদিও এভাবে প্রকাশ্যে আসার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা আমার ছিল না, আমার কর্তাদের তো নয়ই। কিন্তু এই সময় যদি আপনাদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে না দিই, আপনাদের জন্য তাদের এই কর্মযজ্ঞের কথা না বলি, তাহলে ওনাদের প্রতি অবিচার করা হবে।

বছর-খানেক ধরে আপনারা কৃষি বনাম শিল্প নিয়ে বিতর্কে মেতেছেন। সমাজের সর্বস্তরে এই বিতর্ক পৌঁছে গেছে। সমস্ত পত্র-পত্রিকায়, অফিস, বাস, ট্রেন, বাজারে দেখেছি শুধু একটাই আলোচনা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম।

এতদিনের এই বিতর্কের শেষে দেখলাম আপনারা কৃষির পক্ষেই রায় দিলেন। আপনারা বুঝিয়ে দিলেন যে কৃষি ও কৃষকদের প্রতি আপনাদের দরদ কতখানি। আপনাদের এই সমর্থন আমাকে অনুপ্রেরণা দিল আপনাদের সামনে আসার, আমার কর্তাদের নিঃশব্দ কর্মপ্রচেষ্টার কথা প্রকাশ্যে আনার।

নিশ্চয়ই ধাঁধায় পড়ে গেছেন যে আমি কে? আমার কর্তারাই বা কারা, আর এই কর্মকান্ডটাই বা কী? বলছি—

আমি হলাম জার্মানির 'মেট্রো ক্যাশ এন্ড ক্যারি', আমেরিকার 'ওয়ালমার্ট', ফ্রান্সের 'ক্যাফু', পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ফলের কারবারি 'ডোল', 'পেপসিকো' এবং আরো কয়েকটি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার প্রতিনিধি। আমরা এসেছি রাজ্য জুড়ে আপনাদের কৃষিক্ষেত্র ও কৃষকদের এক বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে সামিল করতে। কৃষকদের সাথে বিশ্বায়নের পরিচয় ঘটাতে।

আমরা আপনাদের অচল মান্ধাতার আমলের দেশজ কৃষিব্যবস্থা ভেঙ্গে আমাদের নিজস্ব সরবরাহ ব্যবস্থা ও আমাদের উন্নত প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এক রপ্তানিমূলক কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করতে চাই। আপনারা তো জানেন যে আপনাদের কৃষিব্যবস্থা আর লাভজনক নয়। কৃষকরা যে ধান, আলু ইত্যাদি চাষ করেন তা বিক্রি করে ন্যায্য মূল্য পান না। আপনাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান খুব খারাপ, এই খাদ্যশষ্য বিদেশে রপ্তানি করা যায় না। আপনাদের উৎপাদিত আলু থেকে উন্নতমানের চিপস্ তৈরি করা যায় না। তাই আমরা আপনাদের দিয়ে

লাভজনক অর্থকরি ফসল উৎপাদন করাব। আমরা কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশের পরে এ রাজ্যকে বেছে নিয়েছি আমাদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে। আমরা এখানে খাদ্যশস্যের বদলে ফুল, ফল, সব্জি ফলিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করে বিদেশে রপ্তানি করব। আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারকেও এই কর্মযজ্ঞে সামিল করতে পেরেছি। চুক্তিচাষ নামক এক নুতন পদ্ধতির মাধ্যমে এই কাজ আমরা সফল করব।

এই চুক্তিচাষ বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করি। এই নুতন ব্যবস্থায় জমিগুলি আসবে চুক্তিচাষের আওতায়। কৃষির সমস্ত প্রযুক্তি এবং উপকরণ যথা কৃষিকাজ, সার, আগাছানাশক, ট্রাক্টর ভাড়া প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করব আমরা।

কৃষকরা দেবেন তাদের জমি, শ্রম ও জল (অন্ধ্র ও কর্ণাটকের মতো যেখানে জলের অপ্রতুলতা থাকবে সেখানে জলটাও আমরাই বিক্রি করব)। এখানে আমরা বৃহৎ জমিগুলির সাথে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জমিগুলিকে একত্রিত করে গড়ে তুলব বৃহৎ বাণিজ্যিক কৃষিখামার। এই চুক্তিচাষে ফসল নির্বাচন করার অধিকার থাকবে আমাদের। আমরা যে ফসল চাইব কৃষকদের তাই ফলিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। ফসলের ঝুঁকি কৃষকের। আমরা ঋণ দেব কিন্তু ক্ষতি হলে দায় আমরা নেব না। আপনারা যেন আবার ফসলের দাম না পেয়ে ঋণের জ্বালায় ওই বিদর্ভের বোকা কৃষকগুলির মতো আত্মহত্যা করে বসবেন না।

আমাদের এই বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা হবে উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর ও যন্ত্রনির্ভর। এই ব্যবস্থায় আমেরিকার কৃষকদের মাথাপিছু উৎপাদন এখানের কৃষকদের তুলনায় দু হাজার গুণ বেশি। যদিও এতে করে বিপুল সংখ্যক কৃষিকর্মী ও ক্ষেতমজুর কাজ হারাবে। তাদের কাজ দেবার ব্যবস্থা সরকার করবে। কিভাবে করবে কোথা থেকে করবে তা যদিও আমরা ও সরকার কেউই জানি না।

এবার বলি এ রাজ্যের জন্য আমাদের বিশেষ পরিকল্পনা। আমাদের কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে যেহেতু আমরা চাই সর্বোচ্চ মুনাফা তাই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চমূল্যের ফসল ও বিদেশী বাজারের চাহিদা অনুযায়ী অর্থকরী ফসল। আমাদের পরামর্শদাতা ম্যাকিনসন্ এন্ড কোম্পানীর পরামর্শ মতো আমরা এ রাজ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেছি—

প্রথমভাগে থাকছে বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর। এখানে আমরা ১৪ শতাংশ জমিকে প্রথাগত চাষের আওতা মুক্ত করে উৎপন্ন করব চাল। তবে এই চাল আপনাদের খাবার মোটা চাল নয়। এ চাল হবে রপ্তানীযোগ্য লম্বা দানার সরু চাল বা বাসমতির মতো সুগন্ধি চাল। এখানে আমরা আলুও ফলাব তা যদিও আপনাদের ঘরে খাবার নয়, এ আলু হবে পটেটো চিপস্-এর জন্য বিশেষ প্রযুক্তিজাত আলু যা আমরা পাঠিয়ে দেব পেপসিকোর মতো চিপস্ তৈরির

কারখানাতে।

দ্বিতীয় অঞ্চল হল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরকে নিয়ে। এই অঞ্চলে আমরা ১৫ শতাংশ জমি চাই। এখানে আমরা ফলাবো আনারস, ট্রপিকানা ব্র্যাণ্ডের বিদেশী বীজের কমলালেবু ও আমাদের স্বপ্নের ফসল গারকিন, বেবিকর্ণ জাতীয় ফসল। যদিও এসব ফসল আপনারা খাওয়া ও চোখের দেখা তো দুরের কথা, নামও শোনেননি। কিন্তু তাতে আর কি—এ তো আর আপনাদের জন্য না—এগুলি সবই বিদেশী বাজারের জন্য।

মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর-চব্বিশ পরগনা ও হুগলী নিয়ে হল আমাদের তৃতীয় অঞ্চল। এখানে আমরা ২৫ শতাংশ জমি ফাঁকা করে চাষ করব আম, লিচু, লেটুস, টমেটো সহ নানা অর্থকরী ফল ও সবজি।

এগুলো সবই হবে উচ্চমানের রপ্তানীযোগ্য ফসল। পুরুলিয়া, হাওড়া, কোচবিহার নিয়ে এই চতুর্থ অঞ্চলটিতে আমরা সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর উন্নতমানের ধান চাষ করব।

এই সমস্ত পরিকল্পনা রূপায়নের উদ্দেশ্যে আমরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমাদের 'ডোল' নামক সংস্থাটি উত্তরবঙ্গে প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমির দখল নিতে উদ্যোগ নিয়েছে। এরা পণ্য ইউরোপে রপ্তানী করবে। এছাড়াও পেপসিকোর জন্য আলু ও ট্রপিকানা ব্র্যান্ডের কমলালেবুর কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি। আমাদের আর এক কোম্পানী 'মনসান্টো' (মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের তুলো চাষের সেই বিখ্যাত কোম্পানী)-র হয়ে স্থানীয় কোম্পানী 'মাহাইকোর' (এরাই বিদর্ভে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কৃষকদের বুঝিয়ে জমি তুলে দিয়েছিল মনসান্টোর হাতে) বিটি বেগুন ও বিটি ঢেঁড়শের পরীক্ষামূলক চাষ শুরু করেছে ও আরো অন্যান্য জৈব প্রযুক্তিজাত বন্ধ্যা বীজের প্রয়োগ শুরু করেছে। যদিও এগুলি এখনও বে-আইনি কিন্তু সরকার খুব শীঘ্র এগুলিকে আইনি করতে চলেছেন (টাকা এলে, ক্ষমতা থাকলে আইনের বদল করাতে আর কতক্ষণ)।

আশা করি এর সুফল ও প্রয়োজনিয়তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। যদিও কিছু নাক উঁচু লোক সমালোচনা শুরু করেছেন যে—২০১০ সালে নাকি আপনাদের রাজ্যের ৯.৪ কোটি মানুষের জন্য বছরে প্রায় ১৮৮ লক্ষ টন খাদ্যশষ্যের প্রয়োজন আর বর্তমান উৎপাদন ১৬৫ লক্ষ টন। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে আপনাদের রাজ্য নাকি এখনও স্বনির্ভর নয়। এ রাজ্যে গমের চাহিদা ১৯.৩৩ লক্ষ টন আর উৎপাদন ১০.৫৯ লক্ষ টন, ডাল ও তৈলবীজের চাহিদা যথাক্রমে ১১.২৭ ও ১৪.৪৯ লক্ষ টন আর উৎপাদন ২.২ ও ৫.৬ লক্ষ টন। এই অবস্থায় রপ্তানিমূলক কৃষিপণ্য উৎপাদন আত্মহননের সামিল।

২০০৪-০৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী নাকি অক্টোবর ০৩ থেকে

সেপ্টেম্বর ০৪—এই বারোমাসে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে ২৫.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আনতে হয়েছিল। অর্থাৎ এঁরা বলতে চাইছেন যে আমাদের এই রাজ্যে ১৫ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের ফলে নাকি আপনাদের খাদ্যশস্যে আরও বেশি টান পড়বে, গরীব মানুষ নাকি কম দামে খাবার পাবে না। আপনাদের স্বনির্ভর কৃষিব্যবস্থা ধ্বংস হবে—এইসব। কিন্তু আপনারা তো জানেন যে অভুক্ত অনাহারে থাকা আপনাদের রাজ্যের মানুষের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ তো ইতিমধ্যে অনাহারে প্রথম হয়ে রেকর্ড করেছে, এ রাজ্যে প্রতি দশজন মানুষের মধ্যে একজন অভুক্ত থাকেন, আর আধপেটা খাবার ব্যাপারে আপনারা তো প্রতিযোগিতায় ওড়িষ্যার সাথে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। শহরে অনাহারেও আপনারা প্রথম। আপনাদের রাজ্যের ৩৪৭টি ব্লকের মধ্যে ১৪৭টি ব্লকে অর্ধেক সময় কোনও খাবার জোটে না, আর ৮২টি ব্লকে তো ন্যুনতম খাবারও জোটে না। তিন বছরের নিচে অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভোগা শিশুর সংখ্যায় আপনারা জাতীয় গড় ৭৪ শতাংশ ছাড়িয়ে ৮২ শতাংশে পৌঁছে গেছেন। ফলে খাবার একটু কম পেলেও তো আপনাদের অসুবিধা হয় না। ওঁরা আরো বলছেন যে এই প্রযুক্তিনির্ভর চাষে আপনাদের লক্ষ লক্ষ কৃষি কর্মী কাজ হারাবে, কিন্তু সেটাও তো আপনাদের অভ্যাস আছে। গত কয়েক দশকে ৫০ হাজারের বেশি কারখানা বন্ধ হয়ে তার শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন। আর আপনাদের ৯৪ লক্ষ কৃষিকর্মী বছরে তো এমনিতেই বড়জোর ১৫০ দিন কাজ পায়। আপনাদের ভূমিহীন কৃষক তো ৬৩ শতাংশ, আর আপনাদের সরকার তো এদের জন্য ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প এনেছেন। যদিও এ রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় ৩০-৪০ দিনের বেশি কাজ হয় নি। আর ওঁরা আরও বলেছেন যে এমনিতেই এখানে দীর্ঘ দিনের অপুষ্টি, দারিদ্র, অনাহারের সাথে আমাদের এই কাজের জন্য নাকি ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষেরও সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অতীতে দুর্ভিক্ষও তো আপনারা সহ্য করেছেন।

তাই বলছি সমালোচনায় কান না দিয়ে আমাদের এই সুমহান প্রকৃত কৃষি বিশ্বায়নের কাজকে কুর্নিশ জানান। আশা করি আপনারা নিরাশ করবেন না।

[পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক মঞ্চ প্রকাশিত, পুর্ণেন্দু বসু সম্পাদিত এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল ২০০৯-এ]

৩১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করলো 'পাবলিক প্লেস'—অর্থাৎ সরকারি জমিতে কোনও মন্দির-মসজিদ-গির্জা-গুরুদ্বার ইত্যাদি উপাসনাগৃহ তৈরি করা চলবে না।

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

রবীন্দ্রনাথের স্বরাষ্ট্রচিন্তা ও বর্তমান সময়

মণীশ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথকে আমরা উপনিষদের রস-সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক কবি, বাউল, সনাতন তপোবন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ভাবতেই ভালবাসি।

বর্তমান প্রচারমাধ্যমগুলিও কবির বিশেষ মানবতাবাদী সত্ত্বাগুলিকে সযত্নে আড়াল করে সৌখিন রবীন্দ্রপূজায় মেতে উঠেছে। এর ফলে তিনি আমাদের কাছে হয়ে উঠেছেন দূরের কোন সুউচ্চ মিনারবাসী দেবতা। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে যাকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, কিন্তু যিনি আমাদের কোন কাজে লাগেন না।

আমরা যুক্তিবাদীরা মনে করি কবিগুরুর বাণী কোনও স্থবির তত্ত্ব নয়। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বর্তমান কালোপযোগী করে আজও প্রয়োগযোগ্য। এ জন্যেই আজকের এই অশান্ত সময়ে তার রাষ্ট্রনৈতিক সমাজচিন্তা বিষয়ে আলোকপাত করার আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথের লেখা মুক্তমনে পড়লে আমরা এক গতিময়তা অনুভব করব। তার প্রথমদিকের লেখাগুলিতে যে র্যোমান্টিসিজম বা ভাবপ্রবণতার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়, পরিণত বয়সে তার পরিবর্তে স্থান পেয়েছে তথ্যসহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

কিশোর কবিকেও পরাধীনতার গ্লানি কষ্ট দিত। এসময় ঠাকুরবাড়ির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র ‘হিন্দু মেলা’-র আয়োজন করেন। এই মেলাতে কবির জ্যোতিদাদা, গণদাদা’দের লেখা ‘জয় ভারতের জয়’, ‘লজ্জার ভারতযশ গাহিব কি করে’, ‘মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি’ প্রভৃতি গানগুলি গাওয়া হত।

কবি লিখছেন, “জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন—একটা পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন; ঋক্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।”

এখানে বৈদিক ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর আবেগ স্পষ্ট বোঝা যায়। এরপর আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে দেখতে পাই। কংগ্রেসের একাধিক সভা সম্মেলন ছাড়াও ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট (১৮৯২)’-এর সমালোচনা, ‘সিডিশান বিল’-এর বিরুদ্ধে টাউন হলে বক্তৃতা (১৮৯৮), লোকমান্য তিলক-এর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে মামলার জন্য অর্থ সংগ্রহ (১৮৯৮) প্রভৃতি ক্ষেত্রে

তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শুধু নিজের দেশের মধ্যেই তাঁর চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল না। 'ভারতী' পত্রিকাতে (১২৮৮ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ) তিনি চীনে 'অহিফেন যুদ্ধ' বা আফিমের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ঘটা যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রাষ্ট্রনেতাদের আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর প্রবল অনীহা ছিল।

তখন ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে সংগঠিত করার জন্য দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন সভা সম্মেলন আয়োজিত হত। কিন্তু, তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য আয়োজিত সভা ক্রমশ বিদেশী সৌখিন সেমিনারে পরিণত হচ্ছে। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি আক্ষেপের সুরে বলছেন, "এ কনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজি শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরী করিয়া তুলিয়াছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি।"

১৮৯৭ সালের রাজশাহী সম্মেলনীতে তিনি ইংরেজির পরিবর্তে বাংলাভাষায় বক্তব্য প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। এজন্য, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নেতারা বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, ইংরেজি ভাষায় কবির যথেষ্ট দক্ষতা নেই বলে বাংলায় বলেছেন।

এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত নেতাদের আচরণবিধি, ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত লোলুপতা তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল।

ঢাকা ও রাজশাহী সম্মেলনে উপস্থিত নেতাদের তিনি 'বরযাত্রীদলের' সাথে তুলনা করেছেন। শুধু সমালোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, এমন সেমিনারের পরিবর্তে দেশীয় কায়দায় মেলার আয়োজন করে সহজভাবে নিজেদের বক্তব্য জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া নিয়েও তিনি সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন। ঐ প্রবন্ধেই তিনি লিখছেন, "সেখানে যাত্রা-গান- আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূর-দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবার কথা আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।"

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানবতাবাদী সত্ত্বার পরিচয়ও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বাদেশিকতার জোয়ার দেখা দেয়। ভারতের যা কিছু সনাতন চিন্তাধারা তাকেই সাভারকার, বাল গঙ্গাধর

তিলকের ন্যায় নেতারা মহৎ, সুন্দর বলে প্রচার করতে থাকেন। হিন্দু বিবাহে সম্মতিসূচক বিল (Age of Consent Bill), নারীশিক্ষা, গো-রক্ষা সমিতি গঠন সকল বিষয়েই বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন চূড়ান্ত রক্ষণশীল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী। ১৮৯০ সালে কলকাতায় ফুলমণি বাঈ নামক দশ বছরের একটি মেয়ে যৌন সহবাস কালে রক্তক্ষরণের ফলে মারা যায়। ইংরেজ সরকার Sir Andrew Scoble-এর নেতৃত্বে আইনের ৩৭৫ ধারা সংশোধন করে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বারো বছর করলে তিলক একে 'হিন্দু পুরুষদের নপুংসকে পরিণত করার চক্রান্ত' বলে মনে করেছিলেন। দেশের অপর প্রান্তে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী গড়ে তোলেন 'আর্য সমাজ', যার মূল বক্তব্য ছিল—'Go back to Vedas'। ১৯২৫ সালে হেগড়েওয়াড় গড়ে তোলেন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' যা আজ 'R.S.S' নামে খ্যাত (!)।

এর বিপরীতে মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে, রাণাডে, রবীন্দ্রনাথ-রা ছিলেন ভিন্ন পথের পথিক।

বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পকে গান্ধীজি 'অস্পৃশ্যতার পাপের ফলে ঈশ্বরের অভিশাপ' মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরূপ চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেছিলেন। একে বলতেই পারি মুক্তচিন্তার ফসল।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং ১৯১৯ সালের জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তাঁর ৪ বছর পূর্বে পাওয়া 'নাইটহুড' উপাধি ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

এ সময়ে দলে দলে মানুষ সরকারী স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বয়কট করে। ছাত্রছাত্রীরা নতুন চালু হওয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সমগ্র বাংলায় পিকেটিং ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন শুরু হয়। ঘরে ঘরে চরকায় তৈরি বস্ত্র ব্যবহার হতে থাকে। ভাবাবেগে অন্ধ আন্দোলনকারীরা ঢাকা, পাবনা, খুলনা প্রভৃতি স্থানে বিদেশী দ্রব্যের কয়েকটি দোকান জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র জনগণ, বিশেষত দরিদ্র মুসলিমদের এই আন্দোলনে সামিল করা যায়নি। এর কারণ ছিল প্রধানত দুটো—

প্রথমত, ইংরেজদের মিলের কাপড়ের তুলনায় দেশীয় চরকায় তৈরি কাপড়ের উৎপাদনমূল্য বেশি হওয়ায় তার বাজারদর ছিল অত্যন্ত বেশি। অপর কারণটি ছিল সামাজিক। তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ প্রধানত ছিলেন জমিদার বা উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী। যে কংগ্রেসী 'বাবু'রা কোনদিন এসকল জনগণকে মানুষের মর্যাদা দেয়নি, তাদের কথায় এরা বিশ্বাস করে আন্দোলনে যোগ দিতে পারেনি।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের এই জোরজবরদস্তির ফলে আন্দোলনে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই সতর্ক করেছিলেন। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন, "জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না?"

'যাহারা কখনও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য কোন উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবরদস্তি করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না'—দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ও নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।" এসকল ক্ষেত্রে 'দেশমাতৃকা' নামক ভাবাবেগের পরিবর্তে সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করার চেষ্টাই দেখা যায়।

১৯২০-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে এসে ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র হতশ্রী গ্রামগুলির উন্নয়নের দিকে নজর দেন। সম্ভবত তৎকালীন নেতৃবৃন্দের বাগাড়ম্বরে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'স্বরাজ' পেলে আমরা কী করতে পারি তার প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া উচিত। কারণ তাহলেই সমগ্র জাতি স্বরাজের স্বপ্নকে সত্যি বিশ্বাস করতে শিখবে। তাই তিনি বলেছেন—"আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপর অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য মনে করিনে। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। যে মানুষ বলে, 'আগে ফাউন্টেন পাব তারপর মহাকাব্য লিখব', বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়।" এই অসাধারণ উপলব্ধি তিনি কোথায় পেলেন তা জানতে আমাদের তাঁর জীবনের দিকেই দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, বিশ শতকের প্রথম থেকে কবি সাম্যবাদী, মার্কসবাদী চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে থাকেন। ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণকালে যা আরও সুদৃঢ় হয়। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "একটি দেশ ধর্মপরিচয়হীন হয়েও যে প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে, এই বিষয়টিই কবিকে আগ্রহী করে তুলেছিল।"

বাংলাদেশের কৃষকের সমস্যা তাঁকে চিরকালই ভাবিয়েছিল। মার্কসবাদ সেই সমস্যা সমাধানের সঠিক দিশা দেখিয়েছিল। তাই যে কবি একসময় কৃষকের 'দু-বিঘা জমি' হারানোকে ত্যাগ মাহাত্ম্যে ভূষিত করেছিলেন, সেই তিনিই 'আফ্রিকা'

কবিতাতে শ্রমজীবি মানুষকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বলেছেন। তাঁর লেখা 'ঐকতান', 'ওরা কাজ করে', 'মাধো' প্রভৃতি কবিতায় আছে খেটে খাওয়া গরীব শ্রমজীবি মানুষের প্রতি অকুন্ঠ সমর্থন। 'মাধো'-তে তিনি চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের আন্দোলনের কথা লিখেছেন। ১৯৩৭ সালে চটকল শ্রমিকদের টানা ৭৪ দিন চলা ধর্মঘটকে তিনি প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়েছিলেন। আবার ছোটদের জন্য লেখা 'বড়ো খবর' গল্পটিতে তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন নৌকোর মূলশক্তি 'পাল' নয় 'দাঁড়'। অর্থাৎ শ্রমজীবি মানুষই হল সমাজের মূল প্রাণশক্তি।

মার্কসবাদ তাঁকে বুঝিয়েছিল এক নিদারুণ সত্য। সভ্যতার আদিম লগ্নে মানুষের মধ্যে ছিল না কোন ভেদাভেদ। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পদের সৃষ্টির কালে কিছু শক্তিমান মানুষ ও কিছু বুদ্ধিমান মানুষ ষড়যন্ত্র করে সমাজের সকল সম্পদকে কুক্ষিগত করেছে। এই শক্তিমান মানুষ কালক্রমে হয়ে উঠেছে রাজা বা জমিদার এবং বুদ্ধিমান মানুষরা হয়েছে পুরোহিত সম্প্রদায়। পুরোহিত সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনিয়ে মানুষের বঞ্চনাকে সহনীয় করে তুলে শোষণ যন্ত্রকে মসৃণ করে চলেছে। তাই মাদুরাই এর মন্দিরে বিগ্রহের লক্ষাধিক টাকার অলঙ্কার তাঁর চোখে জল এনেছিল—"কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ঐসব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।" তাই প্রচলিত অর্থে অর্থনীতিবিদ না হয়েও তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন এক আশ্চর্য কথা—

"ধনের ধর্মই অসাম্য।...ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচ জনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এই জন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র সৃষ্টি করিয়া থাকে।" *(প্রবন্ধ : সমবায় নীতি)*

বাংলাদেশের কৃষকদের সমস্যার সমাধানে তিনি প্রধানত দুটি ব্যবস্থা করেছিলেন। এক, কৃষি ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তির প্রচলন এবং দুই, গ্রামে কৃষি সমবায় গঠন। 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তিনি একই কথা বলেছেন। এখানে তিনি যখন ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন তখন ভারতের কোন দেশীয় স্কুলে ঐ ব্যবস্থা ছিল না। নিজের স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করে সেই অর্থে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং জামাই নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান (Agronomy) পড়তে পাঠান। কবির চেষ্টাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কৃষিবিজ্ঞান' একটি বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়। তার খয়রা এস্টেটের টাকাতেই ঐ বিভাগটি পরিচালিত হত। এ বিষয়েও তিনি ছিলেন সমগ্র দেশের পথপ্রদর্শক।

রথীন্দ্রনাথ যিনি শুধুমাত্র তাঁর বাবাকে 'একটু সুখী করিতে পারিব' এজন্য সারাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর কথা না বললে এ লেখা অসম্পূর্ণ থাকবে। বৃদ্ধ কবির শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দায়ভার তিনি নিজের

কাঁধে তুলে নেন। দেশে ফিরে এলেও তিনি ডাকযোগে নগেন্দ্রনাথ মারফত বিদেশে প্রকাশিত কৃষিবিজ্ঞান সংক্রান্ত জার্নাল নিয়মিত সংগ্রহ করতেন। বীজবিহীন ফল বিশেষত লেবু ও টম্যাটো চাষের উপর তিনি প্রচুর কাজ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যুগের থেকে অনেকটাই এগিয়েছিলেন।

কৃষিতে উন্নত পদ্ধতির প্রচলনের মত ধনের সমবন্টনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সমবায় সমিতি' গঠনেরও প্রচেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সেসময় সমবায় গোষ্ঠীগুলির অবস্থা কেমন ছিল সেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক।

Frederick Nicholson-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে 'সমবায় সমিতি' সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। ১৯১৭-১৮ সালে বাংলাদেশে সমবায় ঋণদান সমিতি ছিল ৪০০০।

কৃষকদের ক্রয়-বিক্রয় সমিতি ছিল ৮টি ও দুগ্ধ উৎপাদন সমিতির সংখ্যা ছিল ৪। একমাত্র উল্লেখযোগ্য কৃষি উৎপাদন সমিতি ছিল রাজশাহী, নওগাঁর গাঁজা চাষীদের সমিতি।

এবারে আসুন আজকের তারিখে কবির সাধের বাংলাদেশের সমবায় গোষ্ঠীগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে 'তন্তুজ'-এর মত যে ক'টি সমবায় গোষ্ঠী আছে তার সবকটিই বিশেষ রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ বেকার যুবকরা ব্যাঙ্কের থেকে সহজে কোন ঋণ পায়না। অবস্থা দেখে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুস বলতে বাধ্য হয়েছেন—'ব্যাঙ্ক ভুলে গেছে ঋণ দেওয়াটাই তাদের ধর্ম'। আর বাংলাদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' ঘটিয়ে চলেছে নিঃশব্দ বিপ্লব। এই ব্যাঙ্ক প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে প্রায় ৬৪ লক্ষ গরীব অসহায় মানুষকে। এই ক্ষুদ্র ঋণকে (Micro credit) কাজে লাগিয়ে তারা মুরগি পালন, মাশরুম চাষ, আচার তৈরী প্রভৃতি কাজ করে স্বনির্ভর হচ্ছে। এই ব্যাঙ্কের অপর বৈশিষ্ট্য হল ঋণগ্রহীতা-দের মধ্যে ৯৬% মহিলা।

রবীন্দ্রনাথের এই স্বরাজ আন্দোলনকে আমরা 'গঠনমূলক অসহযোগ' বলতে পারি। তিনি ইংরেজ শাসককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের ভিতরই অপর একটি সমান্তরাল রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাষায়, "তাঁর উদ্বেগ ছিল কিভাবে আরও বেশি করে গঠনমূলক কাজ করা যায়—যার ফলে জনসমর্থন ও সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। তিনি যা বলেছিলেন সেটি হল আইরিশদের সিনফিন আন্দোলনের মূল কথা। এই চিন্তাধারার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত ছিলাম।" এরপরও কি আমরা রবীন্দ্রনাথকে একজন বিপ্লবী বলব না?

এভাবেই গত বছর স্বয়ম্ভর গ্রাম গঠনের মাধ্যমে ২৫০ বছরের রাজতন্ত্র থেকে

মুক্ত হয়েছে নেপাল। ভারতে ৬০০টি জেলার মধ্যে প্রায় ২৪০টি জেলাতে আজ একইভাবে একটি সমান্তরাল প্রশাসন ব্যবস্থা চলছে। এরা প্রয়োজনে সরকারের সাহায্য নেয় কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মীদের অযথা হস্তক্ষেপ সহ্য করে না।

ভারত সরকার তার প্রচার মাধ্যম দ্বারা প্রচার করে এইসব 'মাওবাদী' অঞ্চলে মাওবাদীদের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

কিন্তু ১৫ এপ্রিল ২০০৭ রাষ্ট্রসংঘ ছত্তিশগড়কে পৃথিবীর সেরা অঞ্চল হিসেবে পুরস্কৃত করেছে। যে ভারতের স্থান মানবোন্নয়নে ১২৭ নম্বরে সেই দেশেরই একটি রাজ্য মানবোন্নয়নে সারা বিশ্বে হচ্ছে ১ নং। আশ্চর্য লাগছে, তাই না?

সব দিক বিবেচনা করে কাদের আপনারা 'দেশদ্রোহী' বলবেন—সেই বিচার পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

২০০৯ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শপথগ্রহণের দিন লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিল— এক-তৃতীয়াংশ মন্ত্রী 'ঈশ্বরের নামে' নয়, সত্যের নামে শপথ নিলেন।

শ্রাদ্ধ নয়, শ্রদ্ধাবাসর

সম্প্রতি হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট কর্মী দিলীপ দাস মন্ডল, তাঁর মা পারুল দাস মন্ডলের মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হুগলি জেলার শ্যাওড়াফুলির কাছে ছিনামোড় গ্রামে সাড়া ফেলে দিয়েছেন।

মায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে গতানুগতিক সমস্ত রীতি পরিহার করে, পারুল দেবীর বড় ছেলে দিলীপ ১৮ মে, ২০০৯ দুপুরে একটি স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আগত প্রায় তিনশো অতিথি, আত্মীয় পরিজন অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে আসন গ্রহণ করেন। অনেকেই তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে মৃতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন—ভাষণ, গান, পুষ্পস্তবক দান ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে। আড়াই ঘন্টাব্যাপী এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর দুপুরে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল।

পরবর্তী দিনগুলিতে অঞ্চলের বহু মানুষ এবং আত্মীয়স্বজনেরা এই সুন্দর পদ্ধতিতে মৃতার স্মরণব্যবস্থাকে সাধুবাদ জানান। শুধু নিমন্ত্রণ খেতে আসার চেয়ে এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক বলে তাঁরা মনে করেছেন। তাদের অনেকের কাছেই এরকম ঘটনা এই প্রথম।

স্বল্পভাষী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দিলীপ পারিবারিক বাধাকে অতিক্রম করে সবাইকে নিয়ে যেভাবে কাজটি পরিচালনা করেছেন—তাকে সাধুবাদ দিতেই হয়।

ফি চা র

ওই মেয়েটির মনের কোণে আরেক মেয়ে থাকে

[*কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষণের কারণে এ লেখা নয়। বরঞ্চ এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত মহিলার বিষয়ে এই লেখা একপ্রকার আত্মরোমন্থন, তার প্রতি কোনও পক্ষপাত না রেখে*]

১.

জ্যোতি বসুকে প্রথম চাক্ষুষ দেখি ১৯৮২ সালে রবীন্দ্রসদন মঞ্চের ওপর মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রী হিসাবে প্রাইজ নিতে গিয়ে। আমার বাবা তাঁর প্রতি যারপরনাই শ্রদ্ধাবনত ছিলেন, তবুও মনে পড়ে ভূমিসংস্কার, গরীব মানুষের স্বাভাবিক চোখ ফোটার দিনগুলিতে তিনি মঞ্চের ওপর গরীবের নেতাটিকে দেখে বলেছিলেন, কি চক্চকে লাগছে রে জ্যোতিবাবুকে, ...! তখনও নকশাল আন্দোলনের রক্তমাখা কাদা শুকোয়নি। মনে আছে কুখ্যাত সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে নাকি অন্দরমহলের দিকে সুখ্যাত জ্যোতিবাবুর বড় আন্তরিক মেলামেশা—এইসব গুজব শুনতাম। একটু বড় হবার পর বুঝলাম ফ্রন্টের মন্ত্রীরা সকলেই বিদ্যা, রুচি বা মহান রাজনৈতিক চেতনায় অনেক পরিশীলিত মানুষ; অন্যদিকে কংগ্রেসে প্রায় কেউ নেই। সেখানে প্রিয় সুব্রত মমতা। প্রথম দুজন মন্দ নন তবে গভীরতায় গোড়ালি ডোবে না। আর আছে কালীঘাটের ওই অসংস্কৃত মহিলা নেত্রী। মেয়েটির কথাবার্তায় পালিশ নেই, আছে বেমক্কা বাম বিরোধীতা আর বিশ্রী জেদ।

২.

দলীয় দাদাদের সঙ্গে এই কন্যের বিরোধও নিয়মিত হতে লাগল। যে-ই তাকে কব্জাবদ্ধ করে দাদাগিরির ছায়ায় আনতে চেয়েছে, সেখানে বিফলতা আর পাল্টা ক্ষোভ। সাজানো গোছানো বিরোধীতা নয়, একেবারে দাঁত কামড়ে বারে বারে প্রবল পরাক্রান্ত সরকারের বিরুদ্ধে অত হাঁইচাঁই তো সত্যিই খারাপ লাগত দাদাদের। বামেরা তাই বিরোধীতার মূল ওপড়াতে মমতা-নিধনের রাস্তায় সহজেই চলতে লাগল। বার বার পুলিশের লাঠি বা প্রত্যক্ষ আঘাতে মেয়েটি গেল হাসপাতালে। ততই তাঁর প্রতি শিক্ষিত, সূক্ষ্ম রুচির মানুষের বাড়তে লাগল বিতৃষ্ণা। এটা নাটক না রাজনীতি! এ প্রশ্ন উঠল।

‘বর্তমান’ নামক সংবাদপত্র মমতানীতিকে বার বার সাড়ম্বরে দেখাতে লাগল, উল্টোমেরুতে ‘আজকাল’ হয়ে উঠল বাম, অতিবামদের মননশীল চর্চাক্ষেত্র।

বস্তুতঃ জ্যোতিবাবুর ওই ব্যারিস্টারী প্রতিপত্তির পাশে শুধু অন্য ঘরানার এই নেত্রীই টিকে রইলেন এক সময়। মানুষ, বিশেষত বামপন্থী মানুষ বলতেন মমতা হলেন সেফ্‌টিভাল্‌ভ। যতদিন তারস্বরে বিরোধীতা করছেন ততদিন বামফ্রন্টের ভাবনা নেই।

আর এসবের মধ্যেও মমতার রাজীব গান্ধীর ছবি বাড়িতে টাঙিয়ে রেখে যথার্থ লড়াকু হবার চেষ্টা সংবাদপত্রে দেখে একদিন হাসি পেয়েছিল। আসলে নেহেরুর রক্তের মানুষদের অনর্গল তোয়াজ কি সকলেই এত আবশ্যক ভাবেন!

প্রচলিত রাজনৈতিক দলের ছক ভাঙ্গতে পারেননি—অনেকটা ক্ষমতার রাজনীতি করবার নানান চমকবাজী ও কৌশল তারও চলার পথের অঙ্গ—এসব ভেবেই অন্য অনেক গিমিকপ্রিয় মানুষের মত মমতার সিপিএমের বিরুদ্ধে ব্রিগেড উপচানো সভায় বা বামেদের মৃত্যুঘন্টা বাজাবার উৎসবে তেমন আলোড়িত হইনি।

তবে ওই যে বললাম, সে সময়ে মার্কসবাদের বই টানাটানির সূত্রে যখন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নীতিকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইতাম, তখন একটা আশ্চর্য সত্য অনুভবে আসত। সেটা এরকম, বিভিন্ন ইস্যুতে আর্ত পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, শতসহস্র সাধারণ মানুষের সাগ্রহ প্রতীক্ষা দেখতে দেখতে মমতা নামের মানুষটি বোধহয় বুঝছেন গণ-আন্দোলনের প্রকৃত মুখ। কারণ অভাব আর 'নেই নেই' এর ক্ষেত্রটি তাঁর শৈশব থেকে জানা, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হবার কারণে। তাঁর সভায় যারা ভিড় করেন তাঁদের আধময়লা জামা প্যান্ট, রুখুসুখু চুল, চোখ তাঁর চেনা। সেখানে শ্রেণিনিরিখে একটা আপনভাব আছেই। যতই কৌপিন পরুন গান্ধী মহারাজও কিন্তু বস্তুতঃ সাহেব অথবা ভগবান, কিন্তু এই মেয়েটি একেবারে তেলচিটে চুলের, হাওয়াই চপ্পল ও সস্তা তাঁতের শড়ির, আমারই ঘরের শান্তি, প্রতিমা, আরতিদের মত। সাধারণ মানুষের কেমন স্বস্তি লাগে।

৩.

দিন যায়, দাদাদের সংসারে টেকা দায় হয়। সোমেন দাদাতো প্রকাশ্যেই মমতার জনপ্রিয়তাকে খোঁটা দেন, সুব্রতদাদাই তো তাঁকে 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' নাম দেন। তাই একদিন ছিন্ন হয় সম্পর্ক। নতুন দল তৈরি হয়, 'ন্যাশনাল তৃণমূল কংগ্রেস' সংক্ষেপে 'তৃণমূল' নামটি বাম-গন্ধী কিন্তু প্রতীক থেকে প্রতীকের ব্যাখ্যা মমতার মতই নিপাট সহজ আর একরৈখিক। 'দলটি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে যাবে, ' বিজ্ঞজন মন্তব্য করেন। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে কেউ পারেননি টিঁকে থাকতে। অমন যে সুভাষ বোস তিনিও ব্যক্তি হিসাবে প্রণম্য। কিন্তু দল হিসাবে?

কী আর করা! নতুন দলের ভার নিয়ে মমতাকে তখন বেশ কড়া স্বৈরতন্ত্রী মনে হতো। আসলে ক্ষমতা আর ল্যাং মারামারির এই দলীয় দুনিয়ায় একটি পুঁচকে সংগঠনকে টিঁকিয়ে রাখতে আমরা হিমসিম খাই, সেখানে রাজনৈতিক দলের

খোলস তৈরি করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা? খুব সোজা নয়, তাই হয়ত অতটা একনায়িকা হতে হয় কালীঘাটের মেয়েটিকে। কিন্তু এখানেই তো সুযোগ ছিল অন্য অনেক নেতার মত দল টিঁকিয়ে রেখে অর্থ ও অন্যান্য সুবিধার কৌশল আয়ত্ত করার, যা গড়পড়তা মানুষ করে থাকে! না, মেয়েটি কিন্তু দল টেকাবার ট্রাপিজের খেলা খেলতে খেলতে নিজস্ব সততা অক্ষুণ্ণ রাখল। আর একবার বলতেই হচ্ছে মার্কসবাদী জীবনদর্শন ও বস্তুবাদী ধ্যানধারণার চর্চার সূত্রে আমার মধ্যে যে মানবতাবাদী নারীবাদ-এর উন্মেষ হয়েছিল তার সূত্রেই মনে হয় মমতা অত ঘোলাজলের মধ্যে থেকেও একজন স্বচ্ছ সোজাসাপটা মানুষই থেকে গেলেন। যে নারী রাজনীতির জন্য বাজী ফেলে দিয়েছেন তার ব্যক্তিগত জীবন কেমন? কুরূপা ছিলেন না, অজস্র পুরুষ দ্বারা পরিবেষ্ঠিত থেকেও কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবেগায়িত হন নি। সংসার, ঘর, সঙ্গীর সব স্বপ্ন যে তিনি নিপাট একজন সাধারণ কন্যে হয়েও বিসর্জন দিলেন, তার মধ্যে কিছু তো সারবস্তু থাকবেই। সংসারে থেকেও তার সুবিধা নিয়ে, অসুবিধে তোয়াক্কা না করা পুরুষ রাজনীতিক নন তো তিনি, তাই ক্রমেই জনগণের আশা প্রত্যাশাকে লালন পালন করেছেন। যখন অগ্রসর মানুষ নস্যাৎ করে দিচ্ছে তার সব, তিনি লিখে চলেছেন বই, বাঁধছেন গান, ছবিও আঁকছেন। আসলে ছুঁতে চাইছেন নিজের সত্বাকে আর ঘুমিয়ে থাকা রাজ্যবাসীর মনের মূল কেন্দ্রটিকে। উপরের এইসব নন্দনশিল্প তার অধিগত হোক বা না হোক, উৎসাহের দিকটি খেয়াল করতেই হয়।

যে গ্রামবাংলা একদিন কম্যুনিস্টদের তেভাগা, তেলেঙ্গানা বা ভূমিসংস্কারের আন্দোলনে কাঁধ দিয়েছিল তারাই ভোল বদলানো শাসকের দমন পীড়নের বিপরীতে মমতাকে বড় নির্ভরতায়, আশ্বাসে আঁকড়ে ধরলেন। কিছু দোদুল্যমানতা ছিলই। ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে হারের সময় এই বেদনা ছিল নেত্রীর মুখে। তিনি হারতে হারতেই আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন।

৪

সিঙ্গুরের চাষীবৌরা টাটাবাবুদের গাড়ি আটকে জমি দখলের বিরোধীতা করছে, সেখানে একটা প্রথার বাইরে ঘটনা ঘটছে এসব জানতে আমাদের বেশি সময় লাগেনি। মমতা যে এই আন্দোলনে বাম বিরোধীতা করছেন তাও হাই তুলে আমরা জেনেছিলাম। এ আর নতুন কি! কিন্তু কার্যোপলক্ষ্যে একদিন ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে এসপ্ল্যানেড ইস্টে মমতার অনশন মঞ্চটা দেখা হয়ে গেল। ভরদুপুরে দুটো বেঞ্চি এক করে চাদর ঢাকা দিয়ে তখন শুয়ে আছেন তিনি। কেমন যেন অন্য একটা মাত্রা আঁচ করল মন। হঠাৎ একবার চাদর সরিয়ে কাকে যেন কি সব বলেই আবার মুখ ঢাকা পড়ল মমতার। মনে হল যেন স্বতঃস্ফূর্ত চাষী বিক্ষোভের তপ্ত উত্তাপ তার মুখে। মেখে এসেছেন প্রকৃত আন্দোলনের জ্বালা, দেখে এসেছেন লাঠির চুম্বনে রক্তাক্ত কৃষকের কাঁধ। এই কি তবে সেই সন্ধিক্ষণ!

যখন কালীঘাটের সাধারণ মেয়েটি শহুরে বিক্ষোভ ছাড়িয়ে এসে দাঁড়ান গ্রামীণ চাষাভুষোর ক্রুদ্ধতার সামনে! বদলে যান! বদলাতে হয় অনেকটা! যদি তিনিই তখন গণকণ্ঠ না হন তবে অতিবাম কোন কোন গোষ্ঠী অগণিত সাধারণ মানুষ কেন তাকে তথা কৃষকদের সমর্থন করবেন! বুদ্ধিজীবী বা চ্যানেলের চাপানউতোর ছাপিয়ে সামনে এসে যায় এই সত্য, মহিলাটি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং বিপজ্জনক ভাবে প্রকাশ্যে। সম্ভবতঃ এই প্রথম শহর, গ্রামের বিপুল মানুষ ওর একগুঁয়েমি আর জেদকে যুক্তিসম্মত ভাবল। খুব গোপনে হলেও। তবে নন্দীগ্রামের পর মমতাকে অতিস্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির সুন্দর দোলন দেখেছি। যেমন বামেদের অনেকেই বলেছেন সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের সব ব্যাপারটাই ঐ মহিলার ঘটানো। অর্থাৎ চাষীকুলের প্রতিরোধ ইত্যাদি সবই সেকেন্ডারী, প্রথম কথা ঘাসফুলীয় উস্কানি। আবার উল্টোদিকে এই কৃষক আন্দোলনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে করা তথ্যচিত্রে দেখেছি একবারও মমতার প্রসঙ্গই রাখা হয়নি। দুটোই সমান বিপজ্জনক। এককথায় মমতা এই পর্বে এককালে বামঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য অংশের যে নির্ভরতা ও মূল্যায়ন পেলেন, অগণিত চাষীর যে আন্তরিক সহযোগিতা পেলেন তা তাঁর জন্মান্তরই বলা যায়।

সংসদীয় পথে এই আন্দোলনকে প্রচারে এনে তিনি ভোট চাইলেন, পেলেন ও মুকুট পরলেন। এই জয়কে যেমন জনগণের শাসকবিরোধিতা বলা চলে, তেমনি মমতার সামনে আরও এক লাখ টাকার প্রশ্ন এনে দেয়। শাসনের বড়সড় অংশ হয়ে কি আর সম্ভব ওই অন্ধকার গ্রামের কোণে মাটির আন্দোলনে ফিরে আসা? জমির মালিক ও জবরদখলকারীর আপাত লড়াই শেষ হলেও মালিক ও জমির খেতমজুরের লড়াই চিরন্তন। এই অসাম্যের মূল কি তিনি কখনো অনুসন্ধান করবেন? স্থায়ী জবরদখলকারীদের হঠানোর কোন বিকল্প রাজনীতি কি এঁকে ভাবাবে? নড়বড়ে এক কাঠামো নিয়ে ন্যূনতম উন্নয়নের রাস্তা করাই বড় কঠিন, তাহলে বৃহৎ পুঁজির যে থাবা কৃষিক্ষেত্রকে শ্মশান বানাচ্ছে বিশ্বময়, তার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ রাজনৈতিক ভাবনা আছে কি তার?

তাঁর এই অভূতপূর্ব জয়ের মুহূর্তে এইসব ঘ্যানঘেনে প্রশ্ন করার জন্য ক্ষমা চেয়েই বলছি আমরা যারা খোলা, মুক্ত, যুক্তির আলোয় পৃথিবীকে দেখতে শিখেছি তারা যেমন জানি, পাতি মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গী বহুদিন আপনার অন্তরের সততা ও বৌদ্ধিক একাগ্রতাকে তুচ্ছ করেছে, তেমনি এও জানি মেয়েরা যদি শিকল কাটে তবে অবিশ্বাস্য মানবিক শিখর স্পর্শ করতে পারে। তাদের পিছনে জেগে ওঠে অগনিত মানুষের অসাম্যকাতর সমাজ। আপনাকেও তো জ্বলে ওঠা জনতার আন্দোলনের জীয়নকাঠি ছুঁয়ে দিয়েছে মমতা, আপনি নিজেকে জ্বালিয়ে সেই আলো জ্বালাবার দায়িত্ব নেবেন না!

ফি চা র

‘মালেগাঁও বিস্ফোরণ কান্ডে প্রকাশ পেল ‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদ’

সন্তোষ শর্মা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ : মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও। কাল থেকে নবরাত্রি ও ঈদ উৎসব শুরু। তাই মালেগাঁও-এর অঞ্জুমন চৌরাস্তার পুরানো মসজিদের আশে-পাশে লোকেরা কেনা-কাটায় ব্যস্ত। হঠাৎ বিস্ফোরণ। প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, কোনও কিছু বোঝার আগেই এখানে রাখা একটা মোটর সাইকেলে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়। এবং মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় ৭ জন হত, ২৬ জন গুরুতর আহত। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে পুরো এলাকা নাকাবন্দি করে পুলিশ পৌঁছায়। কিন্তু রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে ফুটন্ত লোকেরা পুলিশের ওপর হামলা করে। তাতে পুলিশ কর্মকর্তা সহ ৬ জন কর্মী আহত। পরিস্থিতিকে বাগে আনতে পুলিশ গুলি চালায়।

পুলিশের অনুমান ঘটনার পিছনে কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হাত আছে। আজকের তারিখ পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এই বিস্ফোরণ কান্ডের দায় স্বীকার করেনি।

মহারাষ্ট্র সরকারের সংন্ত্রাসবাদ বিরোধী স্কোয়াড বা অ্যান্টিটেররিজম স্কোয়াড (এটিএস) মালেগাঁও বিস্ফোরণ কান্ডের তদন্তে নেমে যে সত্য পেলো তা বিশ্বাস করা কঠিন হলেও এটাই সত্য যে কিছু ‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদী’ই নিজেদের দেশের জনগণের উপর সেদিন সন্ত্রাসবাদী হামলা করেছিল। ফলে বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে হিন্দু সন্ন্যাসিনী-সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর (৩৮), শিবনারায়ণ, শ্যাম সাহু, অবসরপ্রাপ্ত সেনা মেজর উপাধ্যায় সহ কয়েকজন গ্রেপ্তার। (তারিখ অক্টোবরের ২৪ থেকে ২৯)

মালেগাঁও বিস্ফোরণ কান্ডে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলটি সাধ্বীর। এই প্রমাণের সূত্র ধরে সাধ্বীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তা হল, সে মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে একটি হল উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ‘হিন্দু জাগরণ মঞ্চ’। এছাড়া সাধ্বী ‘ভারতীয় জনতা পার্টির’ ছাত্র সংগঠন ‘অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ’ এবং ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’

এর মহিলা শাখা 'দুর্গা বাহিনী'-এর সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া বাংলাদেশের কট্টর হিন্দু সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র পাওয়া গেছে। পুলিসের দাবি ঘটনার দিন সাধ্বী তার মোবাইলে অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে প্রায় চারশো (৪০০) মিনিট কথা বলে। তার টেপ আছে।

মালেগাঁও বিস্ফোরণে যুক্ত থাকার অভিযোগে 'হিন্দুত্ববাদী' সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা গ্রেপ্তার হওয়ায় একদিকে এমন বিজেপি জাতীয় রাজনীতিতে চাপের মুখে পড়েছে তো অন্যদিকে কংগ্রেস মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভি বিজেপি-কে সন্ত্রাসবাদের 'আঁতুড় ঘর' বলে অভিযুক্ত করেছেন।

মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তকারী দল ধর্মীয় নেতা দয়ানন্দ পান্ডে ও জম্মু-কাশ্মীরে পাঠানো ৪১ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস-এর লেফটেনান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত-কে অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারের পর প্রমাণ পাওয়া গেছে যে পুরোহিত ২০০৬-এ নাসিজের কাছে দেউলিয়া সেনা ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় সেনা হেফাজত থেকে বিস্ফোরক আরডিএক্স চুরি যায়। এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে যে ২০০৭-এ হরিয়ানা সীমান্তে 'সমঝোতা এক্সপ্রেসে' যে বিস্ফোরণ হয় তাতে ওই আরডিএক্স ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ঐ বছরই আজমীর দরগায় যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তার সঙ্গেও পুরোহিতের হাত আছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী সংস্থা।

মালেগাঁও বিস্ফোরণ কান্ডে অভিযুক্ত সাধ্বী, পুরোহিত সহ মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে এটিএস-এর পক্ষ থেকে চার হাজার পৃষ্ঠার চার্জশিট বিশেষ বিচারপতি ওয়াই ডি শিন্ডের আদালতে দেওয়া হয়। চার্জশিটে বলা আছে এইসব অভিযুক্তরাই 'অভিনব ভারতী' নামে এক সংগঠনের ব-কলমে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। এদের মধ্যে পুরোহিত ও সাধ্বীকে ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'মহারাষ্ট্র সংগঠিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন' (মকোকা) আদালত-এর বিচারপতি ওয়াই ডি শিন্ড মালেগাঁও বিস্ফোরণ কান্ডে অভিযুক্তদের 'মকোকা' আইন অনুসারে বিচার শুরু করার নির্দেশ দেন।

৩১ জুলাই খবর পেলাম। অভিযুক্তদের 'মকোকা'র আওতা থেকে বার করে আনা হয়েছে। তারা এখন জামিনে ছাড়া পেতে পারেন।

বি শে ষ প্র ব ন্ধ

‘আইলা’—একটু অন্যভাবে দেখুন

বিপ্লব দাস

আইলা নামের বিধ্বংসী দুর্যোগটির পরবর্তী দু সপ্তাহ ধরে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। ঝড়ের দাপটে রাজ্যের প্রতিটি জেলাকে একসাথে কাবু হতে এবং দুই চব্বিশ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে দুর্যোগের প্রকট রূপ দেখলাম। লক্ষ্য করলাম লোকসভা নির্বাচনে সদ্য ঘা খাওয়া ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের অসহায় জবুথবু অবস্থাটি। যেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অসহায় মানুষগুলির কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কথা সেখানে বামফ্রন্ট পুরোপুরি ব্যর্থ এবং মনে হচ্ছে নির্বাচনে খারাপ ফল করার আঘাত এখনও সামলে উঠতে পারেনি। সরকারের ব্যর্থতার পাশাপাশি এই সরকারেরই দুজন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি ও সুভাষ নস্করের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করতেই হবে। তবে এঁরা ব্যতিক্রম।

বাতাসের গতিবেগ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জলোচ্ছ্বাস প্রবল ছিল ঠিকই তবু ‘আইলা’ নামক এই সাইক্লোনটির এত বড় দূর্যোগ ঘটানোর ক্ষমতা ছিল না। পেরেছে কেবলমাত্র সুন্দরবন এবং পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে জনাধিক্য থাকার কারণেই। তাছাড়া মাত্র ১০০ থেকে ১১০ কিলোমিটার বেগে ধাবমান ঝড় কখনই এ দশা করতে পারত না। তবে হ্যাঁ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ ছিল বেশি।

সাইক্লোনের শক্তি মূলত নির্ভর করে বাতাসের মধ্যে কতটা লুকোনো শক্তি রয়েছে তার ওপর। উষ্ণ এবং আর্দ্র বাতাস থেকে সাইক্লোন বেশি পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে উষ্ণ এবং আর্দ্র বাতাসের পরিমাণ বাড়ছে যার ফলে সাইক্লোনের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশবিদরা এমনটাই মনে করছেন। নাসার বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখিয়েছেন, বর্তমানে প্রতি দশকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে ০.১৩° সেলসিয়াস এবং এর সাথে সাথে তাল মিলিয়ে ঝড়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রায় ৬ শতাংশ। ঝড়ের সাথে বৃষ্টিপাতও ১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। [তথ্যসূত্র : Research Paper of Jet Propolsion Laboratory, Pasadena, California; Published on 28th December, 2008]. ২০০৭ সালে আইপিসিসির অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টগুলিও একই রকম মতামত পেশ করেছিল।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার যে অন্ত থাকবে না সে কথা বিশ্বের তাবড় পরিবেশবিজ্ঞানীরা এক কথায় স্বীকার করে নিচ্ছেন। আর আমরা প্রকৃতির গোঁসা হওয়া টের পাচ্ছি হাড়ে হাড়ে। পরিবেশবিদরা বলছেন উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্র জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ফি বছর জলোচ্ছ্বাস এবং সাইক্লোনের শিকার হবে উপকূলবর্তী নিম্নভূমির অঞ্চলগুলি। বিশেষত ভারত মহাসাগরের উত্তরদিকের সমুদ্রতটে এই লক্ষণ বৃদ্ধি পাবে। আমরা যদি শুধুমাত্র রাজ্যটুকুর কথা চিন্তা করি তাহলে সুন্দরবনের খাঁড়ি অঞ্চল, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি এবং তমলুক মহকুমা, হাওড়া জেলার নিম্নভূমিগুলিতে এ ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকছে।

সুন্দরবনের নদীবাঁধগুলি বয়সের ভারে আজ ন্যুব্জ। তাছাড়া ক্রমাগত পলি পড়ে নদীর তলদেশ উঠে যাওয়ায় এবং জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরনো নদীবাঁধগুলি মেরামত করার পরেও কতটা কার্যকরী হবে প্রশ্ন থেকে যায়। সুন্দরবনে এমন বহু গ্রাম রয়েছে যেখানে জমির উচ্চতার চেয়ে বেশি উচ্চতায় পার্শ্ববর্তী নদীর জল বয়ে চলেছে। গ্রাম আর নদীর মাঝখানের বাঁধ ভেঙে নদীর জল হু হু করে ঢুকেছে গ্রামে। জল বেরোবার জায়গা না পেয়ে স্থলের গ্রামগুলি কার্যত হয়ে পড়েছে জলবন্দি।

বাঁধ আরও উঁচু এবং পোক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও বোধহয় ঠিক হবে না। কেন না ভবিষ্যতের প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঐ উঁচু এবং পোক্ত বাঁধের কোনও দুর্বল অংশ ভেঙে দিতে পারলে স্থলদেশে হু হু করে নদীর জল ঢুকবে এবং বাঁধ উঁচু থাকায় সেই জলস্তরের উচ্চতাও বেশি হবার সম্ভাবনা। তখন দোতলা ঘরের ছাদে কিম্বা ইস্কুল ঘরের টালিতেও ঠাঁই মিলবে না গ্রামবাসীদের।

এবারের আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ মানুষের মধ্যে কম বেশি ১০-১২ লক্ষ মানুষ রয়েছেন যারা ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তীর বিভিন্ন নিম্নভূমিতে বসবাস করেন। ঐ অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলির মেরামতিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় না করে এলাকাবাসীদের পাকাপাকি ভাবে পূনর্বাসন দেওয়াটাই বোধ করি বাঞ্ছনীয়। ভিটে মাটি স্বজন হারানো লোকগুলিকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে না ঠেলে দিয়ে তাদের উঠিয়ে আনা হোক উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া কিম্বা পূর্ব মেদিনীপুরের কম জন-ঘনত্বের এলাকাতে। সারাই আর ত্রাণের পেছনে হাজার হাজার কোটি সরকারি টাকা ব্যয় করার সার্থকতা কোথায় যদি একবারে একটু বেশি ব্যয়ে বরাবরের জন্য সমস্যার সমাধান করা যায়। আন্তর্জাতিক পূনর্বাসন নীতিগুলি মেনে চললে বিদেশি ঋণও পাওয়া যাবে এক্ষেত্রে। তাছাড়া, একসঙ্গে সব্বাইকে না হলেও, যদি ঐসব জায়গায় নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, মানুষ নিজে থেকেও

একটু একটু করে মূল ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

বাধ সাধতে পারে রাজনৈতিক নেতারা। কোনো একটি অঞ্চলের মানুষদের সরিয়ে নিলে সেখানের ভোটব্যাঙ্কে পুষ্ট রাজনৈতিক নেতা রুষ্ট হতেই পারেন। তাদের এ হেন ক্ষুদ্র মানসিকতা রয়েছে আমরা আগেও দেখেছি। সেক্ষেত্রে ধাপে ধাপে পূনর্বাসন নীতি প্রযোজ্য। সময় লাগবে দু-চার বছর। তা লাগুক না। বরাবরের জন্য হাসি ফোটাতে ধৈর্য্য ধরতেই হয়।

বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বছর বছর বন্যার সংখ্যা বাড়ছে।

১৯৫০-১৯৫৯	—	সারা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বন্যার সংখ্যা ৫০টি
১৯৬০-১৯৬৯	—	ঐ সংখ্যা ১১০টি
১৯৭০-১৯৭৯	—	” ” ১৭০টি
১৯৮০-১৯৮৯	—	” ” ২৭৬টি
১৯৯০-২০০০	—	” ” ৪৮৯টি
২০০১-২০০৮	—	মাত্র আট বছরে বন্যার সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়ে গেছে

দৈনিক স্টেটসম্যান

৮ পৃষ্ঠা কলকাতা শিলিগুড়ি ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ শুক্রবার ২২ মে ২০০৯

চাঁদার জন্য ফল আটকে বিতর্কে প্রধান শিক্ষক

শান্তশ্রী মজুমদার

স্কুলে সরস্বতী পুজোর চাঁদা দিতে হবে বলে স্কুলের প্যাডে ছাত্রের অভিভাবককে চিঠি লিখে বিতর্কে প্রধান শিক্ষক। এখন ছাত্রের অভিভাবক স্কুল শিক্ষাদপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে। বাঁকুড়ার পাঁচাল গ্রামের পাঁচাল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সুমন পাত্র। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে সে সরস্বতী পুজোর চাঁদা দেয়নি বলে তার পরীক্ষার ফলাফল আটকে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। গত এপ্রিলে সুমনের বাবা দেবাশিসবাবুকে চিঠি লিখে ওই চাঁদার টাকা চান প্রধান শিক্ষক বিজয় কুণ্ডু। পরে অবশ্য মার্কশিট দেওয়া হয়। কিন্তু মানসিকভাবে ছাত্রকে হেনস্থা করার দায়ে অভিযোগ নিয়ে স্কুলে অবস্থান করে স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ জানাতে চায় অভিভাবকরা।

স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নিয়ম মতো, স্কুলের ছাত্ররা মিলেই এই সরস্বতী পুজো করে থাকে। তাতে শিক্ষকদের অংশগ্রহণ থাকলেও কোনওভাবেই তা বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিটি ছাত্রের চাঁদা দেওয়ার বিষয়টিও বাধ্যতামূলক নয়। ছাত্র চাইলে চাঁদা দিতে পারে। যেমন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত স্কুলগুলিতে কোনও সরস্বতী পুজো হয় না। তবে তার জন্য ছাত্রের ফল আটকানো যায় না।

সুমনের বাবা দেবাশিসবাবুর অভিযোগ, “বিষয়টিকে বাধ্যতামূলকভাবে পালন করার জায়গায় নিয়ে যেতে চায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের ফল প্রকাশের দিন আমার ছেলের নাম চাঁদা বাকি থাকার জন্য তালিকায় রাখা হয়নি। এটা কেন করা হবে?” প্রধান শিক্ষক বিজয়বাবু জানালেন, “বিষয়টি নিয়ে অজথা জলঘোলা করতে চাইছে ওরা। আমরা চিঠি দিয়েছিলাম বটে তবে ফল আটকানো হয়নি ছাত্রের।” তবে দপ্তরের নিয়ম ভঙ্গ করে বিষয়টি নিয়ে জড়িত হয়ে পড়েছে স্কুল পরিচালন কমিটিও। প্রধান শিক্ষক যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে ম্যানেজিং কমিটির সায় রয়েছে।

পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে গেলেও মানসিক হেনস্থার বিষয়টিকেই সামনে রেখে এগোতে চায় সুমনের বাবা দেবাশিসবাবু। তিনি বিজ্ঞান মনস্ক। বাড়িতে বিজ্ঞান ক্লাব চালান। কখনও কোনও পুজোয় চাঁদা দেন না। কোনওভাবেই বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে দেবাশিসবাবুদের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মঞ্চ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জোনাল সম্পাদক বিপ্লব দাস জানালেন, “ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে সরকারি একটি বিদ্যালয়ে সরস্বতীয় পুজোর মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য চাপ দেওয়ার অধিকার কর্তৃপক্ষের নেই।” কলকাতা পুরসভার মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য সংস্থার উপদেষ্টা কমিটিতে রয়েছেন।

স্কুল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে ঘটনাটি শুনে জানিয়েছেন, “এরকমটা হওয়া উচিত নয়, তবে এখনও জানি না। খোঁজ খবর নিয়ে বলতে পারব।” তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

রি পো র্ট

আইলা ত্রাণ

চন্দ্রা কর

‘আইলা’র পর যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন শাখা, বন্ধু ও সহযোগী সংস্থা নানান জায়গায় ত্রাণ-বন্টন করেছেন ও অন্যান্য দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে ত্রাণের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কিছু নাম দেওয়া হল।

৭ জুন ২০০৯ আমি একটি দলের সঙ্গে লঞ্চে ত্রাণ বন্টন করতে যাই। বারোজনের এই দলে যাদবপুর কে.পি.সি. হাসপাতালের মেডিকাল টিম-এর কর্মচারী ও ডাক্তার ছিলেন। ছিলেন সময় পরিবর্তন-এর ফটোগ্রাফার সুব্রত কীর্তি ও আরও দুটি সংস্থার প্রতিনিধি। দলেরই একজনের ভাইয়ের নিজস্ব ছোট লঞ্চ বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রথম সোনাখালি থেকে লঞ্চে ওঠা হয় প্রচুর খাবার—চিঁড়ে, গুড়, বাতাসা, বিস্কুট, জল, ওষুধ, ইলেকট্রল, কেক ও গুঁড়ো দুধ নিয়ে। তারপর আমরা হোগল নদী, কর্তাল নদী দিয়ে ইটাভাটি, নাপিতখালি, বিরাজনগর, সোনাগাঁ (৫, ৬, ৭ নম্বর) গোসাবা, সজনেখালি, দুলকিগ্রাম, দোনের মুখ, গদখালি আদর্শ বিদ্যালয়ে ত্রাণ বন্টন করি। বেশিরভাগই ছোট ছোট দ্বীপ, কম লোকের বাস। বাচ্চারা ধারে দাঁড়িয়ে, জলের বোতল (তাছাড়া উপায় ছিল না তখন) পেয়ে একগাল হাসি, কাদার জন্য কোনও দ্বীপে লঞ্চ ভেড়ানো না গেলে লোকেরাই কাদা ভেঙে এগিয়ে আসছিল। মেয়েরা সাঁতরে এসে আমার কাছে সমস্যার কথা বলছিল। শাড়ি নেই, কাপড়ের অভাবে প্লাস্টিক জড়িয়ে মেয়েরা বাড়িতে বসে আছে বলছিল। ভদ্রভাবে মানুষ লাইন দিয়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিচ্ছিল। হাতে পায়ে চুলকানি ও একজনের ভীষণভাবে পা কেটে যাওয়ার চিকিৎসা করলেন কে.পি.সি.র কর্মী। মহিলা, শিশুর ভিড় বেশি—পুরুষরা ৮১ টাকা দিন হিসাবে বাঁধে মাটি ফেলার কাজ করছে। জলের অভাব সবচেয়ে বেশি, এমনিতে ওরা পুকুরের জল ফুটিয়ে খেত, এখন তো নোনাজল। সাঁতরে এসে বস্তা ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, তারপর লঞ্চ ঠেলে দিচ্ছে ভাঁটার কাদার উপর দিয়ে এসে। এক অল্পবয়সী মা তার কুড়ি দিনের শিশু কোলে দাঁড়িয়ে আছে। [সব ছবি দেখবেন সমিতির ওয়েবসাইটে, ধন্যবাদ সুব্রতবাবুকে।]

ছাঁকনি জাল নিয়ে মাছ ধরছে বাচ্চারা। দয়াপুর দ্বীপে অবস্থা খুব খারাপ। দরমার বেড়ার উপর পলিথিন ভরসা। শেষে বাকি ওষুধপত্র, গদখালি আদর্শ বিদ্যামন্দিরে ত্রাণকার্যরত ভারত সেবাশ্রমকে দিয়ে আসা হল।

২৫ জুন প্রবীর ঘোষ, সুমিত্রাদি, সুদীপ ও জয়দীপ চাঁদা তুলে প্রচুর চাল, ডাল ও আলু এবং অনেক প্লাস্টিক শীট টাটাসুমো গাড়ি বোঝাই করে পৌঁছে দেন কান্তি গাঙ্গুলি পরিচালিত মুকবধির স্কুলে, মুকুন্দপুরে। সেখান থেকে ট্রাকে করে প্রয়োজনমত পাঠানো হচ্ছিল রোজ কান্তিবাবুর পরিচালনায়। কান্তিবাবু ও স্কুলের কর্মীরা খুব খুশি হলেন। কান্তিবাবু—যিনি দিনের পর দিন সুন্দরবন অঞ্চলে থেকে মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ করছেন—বল্লেন, শুধু শুধু ভিক্ষে দিতে চাই না। কাজ করলে—বাঁধ, বাড়ি তৈরির কাজ—তাদের জন্য খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। শাড়ি কিনে রাখা হয়েছে অনেক মেয়েদের জন্যে। কান্তিবাবু বল্লেন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচা যায় না, প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। যেখানে যেখানে বাদাবন আছে সেখানে ভাঙন কম হয়েছে। মানুষ গাছ কেটে বন ধ্বংস করছে বলে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত আরও বছর ৩০-৫০ পর কিছু অঞ্চল তলিয়ে যাবেই—পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, কুলতলি, সাগর ইত্যাদি। মানুষকে সেটা বুঝতে হবে।

ওঁর মনে হয় জোর করে এদের তুলে অন্য জায়গায় বসানো অসম্ভব—এরা জানে জলের জীবন, মাছ ধরা, মাছ খেয়ে অন্তত বাঁচতে পারে। চিংড়ির ছানা (মীন) ধরে টাকা পায় ১০০টাতে ২০ টাকা। এই জীবন ছাড়া অন্য কিছু ওরা ভাবতে পারে না।

বিপত্নীক কান্তিবাবুর নিজেরও সুন্দরবনই প্রাণ। এই নিয়েই আছেন। নিজের সন্তানের মত ভালবাসেন এলাকার মানুষজনকে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শাখা সম্পাদক মৃণাল কয়াল যোগাযোগ করেন সি.এম. জাটুয়ার সঙ্গে। তিনি আন্তরিক পরিশ্রম করে স্থানীয় মানুষ ও ক্লাবের ছেলেদের সাহায্যে ত্রাণের কাজ করছিলেন। তাঁর কথামত মৃণাল নিজে কাকদ্বীপ যায় ও ১ জুলাই যুক্তিবাদী সমিতির তোলা টাকায় প্রচুর নতুন শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি ও মশারি কিনে দিয়ে আসে স্থানীয় প্রাক্তন বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার হাতে।

গত ৪ আগস্ট আরও কিছু টাকা ও জামাকাপড় দেওয়া হয় লেকটাউন অঞ্চলের জমাদার ও তার স্ত্রী ওমর আলি ও লতিফাকে আইলা পীড়িতদের সাহায্যার্থে। তাদের মা (শাশুড়ি) ইছামতীর ওপারে সাতক্ষীরার কাছে কোনও গ্রামে পড়ে আছেন। বাড়ি ভেঙে চালা পড়ে গেছে—তারই নিচে গুটিশুটি হয়ে রয়েছেন ফুলমতী বিবি (৬৫+) তার চারটি ছাগল, ঘরের সমস্ত জিনিস ভেসে গেছে। আম, লিচু গাছ মরে গেছে। তবু বুড়ি—ওসব ছেড়ে আসবে না। কটি নারকোল গাছ বেঁচে আছে, বড় নাতি তার পরিবার নিয়ে সঙ্গে রয়েছে। বাড়ি তৈরি করার জন্য ওমর ও লতিফা টাকা দিয়ে আসবে।

এই হল আমাদের ত্রাণকাজের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এইভাবেই যখন যেমন সম্ভব, যতদিন সম্ভব.....

রি পো র্ট

মালিয়াড়ার পদ্মা রুইদাসকে সম্মান জানাতে মানবতাবাদী সম্মানজ্ঞাপন সভা

যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন বিগত কয়েক দশক ধরেই নারীর অধিকার রক্ষায় লড়াইকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এই অসাম্যের সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য চাই প্রবল আত্মবিশ্বাস ও হীনম্মন্যতার সাথে লড়াই করার মানসিকতা।

গত ৫ জুলাই ২০০৯ বিকেল ৩.৩০ থেকে বাঁকুড়ার মালিয়াড়া গ্রামের রাজনারায়ণ হাইস্কুলে একটি সম্মানজ্ঞাপন সভায় জেলার বুদ্ধিজীবি, সমাজসেবী ও রাজনীতিক সহ সকলকে আহ্বান করা হয়েছিল। জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাসের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক বিপত্তারণ মিশ্র, বাঁকুড়ার অ্যাডভোকেট তরুণ মিশ্র, হাইস্কুল শিক্ষক অসিত সিংহ, সমাজসেবী জয়ন্ত মন্ডল ও চায়না তিওয়ারি প্রমুখ।

পদ্মা রুইদাস নামে এক তেরো বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ভিন রাজ্যের এক ছেলের সঙ্গে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই হঠাৎ বিয়েতে সন্দেহ থেকেই যায় টাকা পয়সা পাওয়া যাচ্ছিল কি না, অর্থাৎ মেয়েটি বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল কি না। ওই অঞ্চলে এমন ঘটনা বিরল নয়। পদ্মা নিজেই রুখে দাঁড়ায় ও অসাধারণ সৎসাহসী কর্মী চায়নার সাহায্যে এলাকার লোকজন জড় করে। পুলিশ গ্রেপ্তার করে পদ্মার বাবা, মা ও হতে-পারত-বর পাপ্পু সাগরকে। আরও যারা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পদ্মার বিয়ে রুখে দিতে এগিয়ে এসেছিল তাদের নাম বাসুদেব লোহার, প্রশান্ত সুকুল, বিশ্বনাথ বাউরি, পরিমল রুইদাস প্রভৃতি এবং বাঁকুড়া যুক্তিবাদী সমিতির দিব্যেন্দু, অসীম, মিলন। ক'দিন ধরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে ছিল বিপ্লব দাসের সর্বক্ষণের সঙ্গী ও ডান হাত প্রশান্ত।

বাঁকুড়া শহর থেকে ৫২ কিলোমিটার দূরে বেলিয়াতোড় জঙ্গলের শালবনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা—যেখানে সরকারি কোনরকম যানবাহনের দেখা পাওয়া যায় না। মোটরবাইক ভরসা। বড়জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালিয়াড়া গ্রাম। এককালের বর্ধিষ্ণু অঞ্চল—ভাঙাচোরা জমিদার বাড়ি এখানে ওখানে। তারই একটি বিশাল বড় বাড়ি—চল্লিশ বিঘা জমি সমেত রাজনারায়ণ হাই স্কুল। অবহেলা ও দারিদ্র্যের ছাপ সর্বত্র—কি স্কুল বিল্ডিং-এ, কি ছেলেমেয়েদের মুখে। অথচ সম্ভাবনা ছিল সব কিছুরই।

এই অঞ্চলে এইসব অবহেলিত ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করার অদম্য সংকল্প দেখলাম চায়না তিওয়ারির মুখে। বিপ্লব ও প্রশান্তর বাইক নিয়ে ছুটে বেড়ানোর মধ্যে দেখলাম এক অস্থিরতা—বিয়ে তো আটকানো হল, এর পর পদ্মার কী হবে? প্রশ্নটা পদ্মাদের মত সকলের কী হবে? পদ্মার দুই দিদিরও তো ঐভাবেই বিয়ে হয়েছিল। তারপর আর তাদের কোনো খবর নেই। এখন পদ্মার পড়াশোনা ও ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান নিয়ে ভাববে কে?

যাই হোক—৫ তারিখের অনুষ্ঠানে আড়াইশোর উপর মানুষের ভিড় হয়েছিল। প্রচুর কচিকাঁচাদের জন্য প্রথমে অলৌকিক নয়, লৌকিক, তারপর সম্মানপ্রদান অনুষ্ঠান।

প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা পদ্মনাভন পদ্মাকে একটি সুদৃশ্য স্মারক ও বারোজন কর্মীকে মেডেল দিয়ে সম্মানিত করলেন। স্কুল শিক্ষিকা ও অন্যান্য অতিথিদের মুখেচোখে আন্তরিক আবেগ ও শ'খানেক ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণে আশা হল ভবিষ্যতে পদ্মাদের মত মেয়েদের ওপর জোরজবরদস্তি করার সাহস আর কারোর হবে না। হতে দেবে না স্থানীয় মানুষেরা।

পদ্মার খবর ও অনুষ্ঠানের রিপোর্ট অনেক পত্রিকায় বেরিয়েছে। কয়েকটি তুলে দেওয়া হল।

রি পো র্ট

কেরলের ‘গুরু’ অমৃতানন্দ চৈতন্য ওরফে মাধবনের ১৬ বছর সশ্রম কারাদন্ড

কোচি, ২ মে-র খবর : কেরালার এর্নাকুলাম অ্যাডিশনাল সেশন কোর্ট সন্তোষ মাধবনকে ধর্ষণ ও যৌন উৎপীড়দের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ১৬ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করল। কোর্ট মাধবনকে দুই ভুক্তভোগীকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ারও আদেশ দিয়েছে। মাধবন একটি নাবালিকা সহ দুইজনকে যৌন উৎপীড়নের জন্য অভিযুক্ত।

মনে পড়ছে মাধবনকে গত বছরই মে মাসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল? সে খবর ছাপা হয়েছিল ‘যুক্তিবাদী’তে। ‘হেডলাইন টুডে’ চ্যানেল ১৭ মে ২০০৮ এই ঘটনাকে ঘিরে গুরু-তান্ত্রিকদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করেছিল ও যুক্তিবাদীদের বক্তব্য এই লাইভ অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছিলেন সুমিত্রা পদ্মনাভন।

ঘটনা হচ্ছে—মাধবন ‘অমৃতানন্দ চৈতন্য’ নাম নিয়ে গুরুগিরির ব্যবসা জমিয়ে বসেছিলেন অনেক দিন ধরেই। কয়েকজন চিত্রতারকাও তার খদ্দের ছিল। পুলিশের কিছু উচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গেও তার সু-সম্পর্ক ছিল। ২০০৮-এ তার ঘর থেকে পাওয়া ব্লু-ফিল্মের সি.ডি., গাঁজা জাতীয় মাদমদ্রব্য ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার যে তার ব্যবসা বেশ কিছুদিন যাবৎ চলছিল। কেন এর আগে ধরা পড়েনি? কারণ কেউ অভিযোগ করেনি।

ঘটনা জানা যায় যখন দুবাই এর এক মহিলা এই ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে টাকাপয়সা নিয়ে প্রতারণা করার অভিযোগ করেন। বিদেশিনীর অভিযোগে তদন্তের কাজ শুরু হয়। জাতীয় চ্যানেলে এই ঘটনা নিয়ে খবর ও অনুষ্ঠানও যথেষ্ট সাড়া ফেলে।

আমরা খুশি এই ঘৃণ্য অপরাধীর যথোপযুক্ত সাজা হওয়ায়। অভিযোগ জানিয়ে দোষীদের কব্জা করতে এগিয়ে আসুন আরও অনেকে। মন্ত্রী-তারকা—এরা আর ক’দিন? যুক্তিবাদীরা থাকবে চিরদিন।

—সম্পাদকমন্ডলী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার সন্তোষ শর্মা ও ছাপতে ছাপতে দৈনিক ১৭ মে ২০০৯

পু স্ত ক স মা লো চ না

দাবানলের অঙ্গীকার বুকে নিয়ে অন্ধকারে ছুটে চলে আগুনের ফুলকি

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলা বেশ কিছুদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত। ওইসব এলাকায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে একটা গেরিলা যুদ্ধ চলছে। ওই অঞ্চলে মাওবাদী গেরিলারা দীর্ঘদিন ধরেই একটা বড়ো অঞ্চলকে তাদের মুক্তাঞ্চল করে রেখেছিলেন। পুলিশ প্রশাসনকে তাঁরা সাধারণ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন দীর্ঘদিনের জন্য। একটা সময় চলে আসে, যখন রাজ্য সরকার বুঝতে পারে তাদের একার শক্তিতে অবরুদ্ধ অঞ্চল পুনর্দখল সম্ভব নয়। গত লোকসভা নির্বাচনে বামেদের ভরাডুবি হওয়ার পর বর্তমানে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক মোটেই মধুর নয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ভাঙার ক্ষেত্রে দেখা গেল সব শেয়ালের এক রা। কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ ভুলে মাওবাদী গেরিলাদের হঠাতে দুই সরকারের যৌথ সশস্ত্র বাহিনী হানা দিল জঙ্গলমহলে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর রণসজ্জা বিশাল। তাদের হাতে অর্থ, অস্ত্র ও নিপীড়নের উপযোগী আইন কোনোটারই অভাব নেই। ফলে এই বাহিনীকে ঠেকানো গুটিকয়েক গেরিলা বা জঙ্গলের রোগাভোগা না খেতে পাওয়া মানুষগুলোর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বাস্তবে ঘটলও তাই। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনীর হাজার হাজার সশস্ত্র জওয়ান এগিয়ে গেল জঙ্গলমহলের দিকে। আকাশে উড়ল হেলিকপ্টার। কেউ সেভাবে প্রতিরোধ করতেই এগিয়ে এল না। কীভাবে কোন প্রেক্ষিতে একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠে গেরিলা মুক্তাঞ্চল? এর পিছনে রাষ্ট্রের ভূমিকাই বা কতটা এসব নিয়েই যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি'। গ্রন্থটির সহ লেখিকা সুমিত্রা পদ্মনাভন। দুজন লেখকই যুক্তিবাদী ও মানবাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের সৈনিক।

কারুর ভালো লাগুক না লাগুক নিজের বিশ্বাসের কথাটা অকপটে বলে দেওয়ার ব্যাপারে প্রবীরের খ্যাতি আছে। তাঁর যুক্তিবাদী গ্রন্থমালার বইগুলির এটাই ধারা। আলোচ্য বইটিতেও তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকে বিদ্ধ করে প্রবীর সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, যতদিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থাকবে, ততদিন গেরিলা যুদ্ধ এবং

পাল্টা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণও থাকবে। প্রতিটি ক্রিয়ার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। বস্তুত মানুষের অধিকার আমাদের দেশের বিভিন্ন আনাচে-কানাচে প্রতিদিনই পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর বুটের তলায় নিষ্পেষিত হচ্ছে। পেশাগত কারণে এই সমালোচক নিজেও বহু পুলিশি অত্যাচারের ঘটনার সাক্ষী। নিজের চোখে গ্রামে-গঞ্জে দেখেছি কখনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে কখনও বা আসামি ধরার নামে পুলিশবাহিনী নির্দোষ গরিব মানুষগুলোর ওপর কী ধরনের অত্যাচার চালায়। রাতবিরেতে ঢুকে বাড়ি ভাঙচুর করে। গোরু-ছাগলের মতো ধরে পেটায়। প্রবীর আমাদের রাজ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও মণিপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গত, তিনি বাংলাদেশ সীমান্তের এক গ্রামে বিএসএফের গুলিতে এক নাবালিকার মৃত্যুর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। আসলে এই সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। ইংরেজ রাজত্বের অবসানের পর এদেশ চালাতে যে সংবিধানের রচনা হয়, তা পুরোপুরি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ধনাঢ্য মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করেই। সংবিধানে গরিব মানুষের স্বার্থে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা আছে ঠিকই কিন্তু মানা না মানায় কিছু যায় আসে না। ফলে আমরা সংধারণ মানুষেরা প্রতিবাদের ভাষা হারাতে হারাতে ক্রমেই ক্লীবত্বকে নিজেদের ধর্ম বলে মেনে নিয়েছি। যারা এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস দেখাচ্ছেন তাদেরকেই কখনও বলছি গেরিলা, কখনও বলছি মাওবাদী আবার কখনও সন্ত্রাসবাদী। আসলে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা হচ্ছে বিরাট একটা ছাঁচ। সে আমাদের সবাইকে তার মনের মত করে গড়ে পিটে নিতে চায়। শেষ অবধি আমরা হয়ে উঠি তাই যা রাষ্ট্র আমাদের বানায়। সূক্ষ্ম বুদ্ধির মানুষ এই ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেই তিনি হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রদ্রোহী। তার জন্য কখনও তৈরি হয় POTA, কখনও আবার AFSPA কখনও UAPA-র মতো আইন। আসলে প্রতিবাদ, প্রতিরোধকে বরদাস্ত করে না রাষ্ট্র। যতটুকু রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা পাই, সেটুকুও মাপ করে ঠিক করে দেয় রাষ্ট্রই।

প্রবীরবাবু এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন রাষ্ট্রের নখ-দাঁত বের করা চেহারা। অজস্র তথ্যপ্রমাণের সাহায্য নিয়ে ধাপে ধাপে পৌঁছেছেন মূল প্রতিপাদ্যে। গ্রন্থের প্রথম পর্বের নাম 'গেরিলা যুদ্ধের A to Z'। এই পর্বে আলোচনা করা হয়েছে সন্ত্রাস, যুক্তিবাদী হওয়ার শর্ত, তিব্বতের আন্দোলন, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয় বোধহয় গেরিলা যুদ্ধের রীতি প্রকরণ সম্পর্কে প্রবীরবাবুর অমূল্য গাইডলাইন। তিনি বিস্তৃতভাবে লিখেছেন কীভাবে চালাতে হবে গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলাদের আদর্শ, আচরণবিধি কী হবে। কীভাবেই বা তারা আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন। রয়েছে সবকিছুরই হালহদিস। প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলির গুণ্ডামোতে মানুষ কীভাবে প্রতিনিয়ত

নিপীড়িত হচ্ছেন, মিলবে তার সুলুক সন্ধানও। বইটি হতে পারে এ রাজ্যের মাওবাদীদের গাইডবুক। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে আজাদি সংক্রান্ত আলোচনা। এখানে মিলবে নারী-মুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামৃত্যু সহ নানা বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা। বোঝাই যাচ্ছে ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভন সৃষ্টিশীল নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছেন। প্রবীরের স্পষ্টভাষি নির্ভীকতার যোগ্য উত্তরসূরি সুমিত্রা নির্ভুল লক্ষ্যে আজকের নারীর জীবনযাত্রার বাঁকবদলের সার্থক কথাকার হয়ে উঠেছেন। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার বইটি যুক্তিবাদী গ্রন্থমালায় এক অমূল্য সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত হবে। প্রচ্ছদ যথাযথ।

গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি
প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা পদ্মনাভন
দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩

কে জিতবে, গণনা করলেই ২৫ লক্ষ

সুমিত গুহ

বছরভর এঁদের ব্যবসা জমজমাট। মন্দাক্রান্ত এই সময়ে তাঁদের ব্যবসায় গ্রহণ লেগেছে এমনটাও শোনা যায়নি। তবে ভোটের সময় বোধ হয় রমরমাটা আরও বেশি হয়। বড়, মেজ, সেজ, ছোট সব ধরনের প্রার্থীই লাইন দেন এঁদের চেম্বারে। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ বা লুকিয়ে। পার্টির অবস্থা, তিথিনক্ষত্রের নিরিখে গুনে দেখে নিদান দেন এঁরা। গম্ভীর মুখে কৃপাপ্রার্থীর হাতের তালুটি আতস কাচের নীচে ফেলে বলতে থাকেন, 'হুঁ, আপনার শনি দেখছি সপ্তম ঘরে বসে রয়েছে। কেতুটাও বেশ জ্বালাতন করবে। আপনি চার রতির নীলা ধারণ করুন। সঙ্গে যদি একটা অ্যামেথিস্ট ধারণ করতে পারেন, তা হলে ফলটা আরও ভালো পাবেন।' সমাধান পেয়ে গদগদ ভোটপ্রার্থী বিনা বাক্য ব্যয়ে পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে উলটো দিকের লোকটির হাতে গুজে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

প্রতিটি নির্বাচনেই এই রকম দৃশ্যের দেখা মেলে জ্যোতিষদের চেম্বারে। প্রত্যেকের নামের আগে কী ভারী ভারী বিশেষন, বাব্বা! জ্যোতিষসম্রাট, জ্যোতিষাচার্য, জ্যোতিষশিরোমণি, তন্ত্রসাধক, এ যুগের খনা প্রভৃতি। সারা বছরই কাগজে, টিভি চ্যানেলগুলোতে বড় বড় বিজ্ঞাপন, তাতে শোভা পায় জ্যোতিষীদের মুখ। তবে বিজ্ঞাপনের বহরটা বেড়ে যায় দু'টি সময়ে। বিশ্বকাপ ফুটবল ও ক্রিকেটের ফাইনালের পর এবং ভোটের ফল বেরনোর পর। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, সেই সময়ে সব জ্যোতিষই তাঁদের বিজ্ঞাপনে একটা

গ্রাফিক্স : সুমন মুখোপাধ্যায়

কমন শব্দ ব্যবহার করেন— অমুক ভোটপ্রার্থীর সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী একমাত্র ইনি-ই করেছিলেন। অথচ কেউ জানে না, কখন, কোথায়, কী ভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। যেমন জানা যাচ্ছে না, এ বারের ভোটে কেন্দ্রে ক্ষমতায় কারা আসছেন বা এই রাজ্যে ভোটের ফল ঠিক কী হতে চলেছে— এ বিষয়ে জ্যোতিষীদের গণনাটা ঠিক কেমন। অথচ, ভোটের ফল প্রকাশের পরই জানা যাবে অমুক আচার্য, অমুক সম্রাট নাকি আগেই সাবর ভাগ্য অক্ষরে অক্ষরে মিলয়ে দিয়েছিলেন আগেই। বছরের পর বছর এই জিনিসই চলে আসছে।

কিন্তু জ্যোতিষীদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে এ বারে নেমেছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। জ্যোতিষীদের উদ্দেশে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন সমিতির সদস্যরা। মাত্র দু'টি প্রশ্ন তাঁরা রেখেছেন তাবড় জ্যোতিষকুলের কাছে। এক) কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমুল, সিপিএম, বিএসপি, আরজেডি, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে এবং এআইডিএমকে এ বারের ভোটে কত আসন পাবে? দুই) মনমোহন সিংহ, সনিয়া গান্ধি, লালকৃষ্ণ আডবানি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লালুপ্রসাদ যাদব ও রামবিলাস পাশোয়ান কত ভোটে জিতবেন? এই 'সহজ' প্রশ্নগুলোর উত্তর ১৪ ও ১৫ মে-র মধ্যে ইমেল করে পাঠিয়ে দিতে হবে যুক্তিবাদী সমিতির দফতরে। অথবা নামকরা কিছু খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেলে জানিয়ে দিতে হবে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী। যাঁর গণনা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে, তিনি পাবেন ২৫ লক্ষ টাকা পুরষ্কার! সে পুরষ্কার আবার নগদ নারায়ণ।

কী ভাবছেন? জয় মা বলে নেমে পড়ুন। একদিনের জন্য সখের জ্যোতিষীও বনে যেতে পারেন। কে বলতে পারে, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে না? পেশাদার জ্যোতিষীরা সম্ভবত ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে চুপ করে থাকবেন। কিন্তু আপনি চুপ করে থাকবেন কেন? এখনই যুক্তিবাদী সমিতিতে ই-মেল করে পাঠিয়ে দিন বা যে কোনও সংবাদমাধ্যমের শরণাপন্ন হোন। আপনার ভবিষ্যদ্বাণী মিলিয়ে জিতে নিন কড়কড়ে ২৫ লক্ষ টাকা। জিততে পারলে মন্দ কী। তবে না-পারলে...!

Now that the votes are in, astrologers are the losers

Shaikh Azizur Rahman, Foreign Correspondent

- Last Updated: May 28. 2009 11:22PM UAE / May 28. 2009 7:22PM GMT

Amritlal is one of Kolkata's best known astrologers. In 1991 he predicted a bright future for the former Indian prime minister Rajiv Gandhi three days later before he was assassinated. Shaikh Azizur Rahman / The National

KOLKATA // Fortune tellers flopped in their quest to predict the outcome of this year's election, with groups dedicated to their demise saying the results prove they are frauds.

Two rationalist groups, which preach against irrational blind faith and superstition, organised competitions for astrologists and other fortune tellers, offering millions of rupees if anyone could accurately forecast who would dominate Indian politics for the next five years.

The first competition, organised by Kolkata's Science and Rationalists Association of India (SRAI), offered 2.5 million rupees (Dh194,000), and the second, held by the Federation of Indian Rationalist Associations (FIRA), offered one million rupees.

The two groups received a total of 450 responses – including a few from amateur psephologists, who use statistical analysis to predict elections – with all of them failing to come even close to picking the winners.

Prabir Ghosh, the SRAI secretary, said "yet again it was proved that astrologers or fortune tellers were fraudsters".

Those who accepted the FIRA challenge were asked to answer 25 questions such as predicting the number of seats to be won by specific mainstream parties, and the number of votes polled by some high-profile candidates.

বইমেলায় বিস্ফোরণ :

গেরিলা যুদ্ধের

প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা

গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে মাও থেকে চে প্রমুখ অনেকেই বই লিখেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেক তত্ত্বই আজ আর ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। গেরিলা যুদ্ধের আধুনিকতম প্রয়োগ দেখা গেছে নেপালে, শ্রীলঙ্কায় ও ভারতের কিছু অঞ্চলে। কী সেই যুদ্ধের প্রয়োগ কৌশল? আধুনিকতম সমস্ত রকমের প্রয়োগ কৌশল নিয়ে এই গ্রন্থ। আছে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

'আজাদি'-তে আছে ২০টি ফিচার। মননশীল, বিশ্লেষণধর্মী এই ফিচারে আছে নার্কো টেস্ট, স্বেচ্ছামৃত্যু, নারী স্বাধীনতা, মেয়েদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার রেসিপি থেকে মণিপুর, কাশ্মীর ও ছত্তিশগড়ে বীভৎস মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিত্যকার ঘটনা। দুই মলাট বন্দি বই দু'টিতে পাবেন উত্তরণের দিশা।

প্রবীর ঘোষ

মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা

১০০

মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী স্মৃতিধর এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার শুনেই নাকি মুখস্থ করে ফেলেন ৭০-৮০ হাজার শব্দের ডিকশনারী। সত্যিই কি তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী? নাকি কৌশলে বোকা বানাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে? আমাদের পরীক্ষায় ১৫-২০টি শব্দও মনে রাখতে পারছিলেন না? জানতে চান? রুদ্ধশ্বাস কাহিনি।

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...

প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

অলৌকিক নয়, লৌকিক

১২৫

(২য়) ১২৫ (৩য়) ২০০ (৪র্থ) ১২৫ (৫ম) ১০০

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : 2219-7920
Fax : 2219-2041 e-mail : deyspublishing@hotmail.com

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন। সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল
ঠিকানা : ৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৫৯-০৪৩৫
● e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com ●
website : www.prabirghosh.tk, www.thefreethinker.tk,
www.juktibadi.tk
কলকাতা অফিস : ৩৩এ ক্রিক রো, মৌলালী, কলকাতা-১৪ থেকে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত

আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং
হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

“সমাজ শুধু মানুষকে প্রভাবিত করে না, মানুষও সমাজকে প্রভাবিত করে। মানুষ যদি একটু করে সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত করতে পারে, তবে মানুষ কেন পারবে না সমাজকে আবার একটু একটু করে দুর্নীতিমুক্ত করতে?”

—প্রবীর ঘোষ

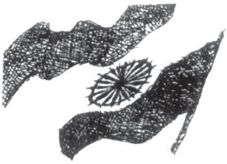

লালগড়-সহ সব সন্ত্রাস বন্ধ হোক
কৃষি বিপ্লব শুরু?
‘আইলা’—অন্য ভাবনা
বেআইনি আইন
রবীন্দ্রনাথের স্বরাষ্ট্র চিন্তা
কেরলের গুরুবাবাজীর কারাদন্ড
মালেগাঁও বিস্ফোরণের নেপথ্যে
টুনটুনির গল্প